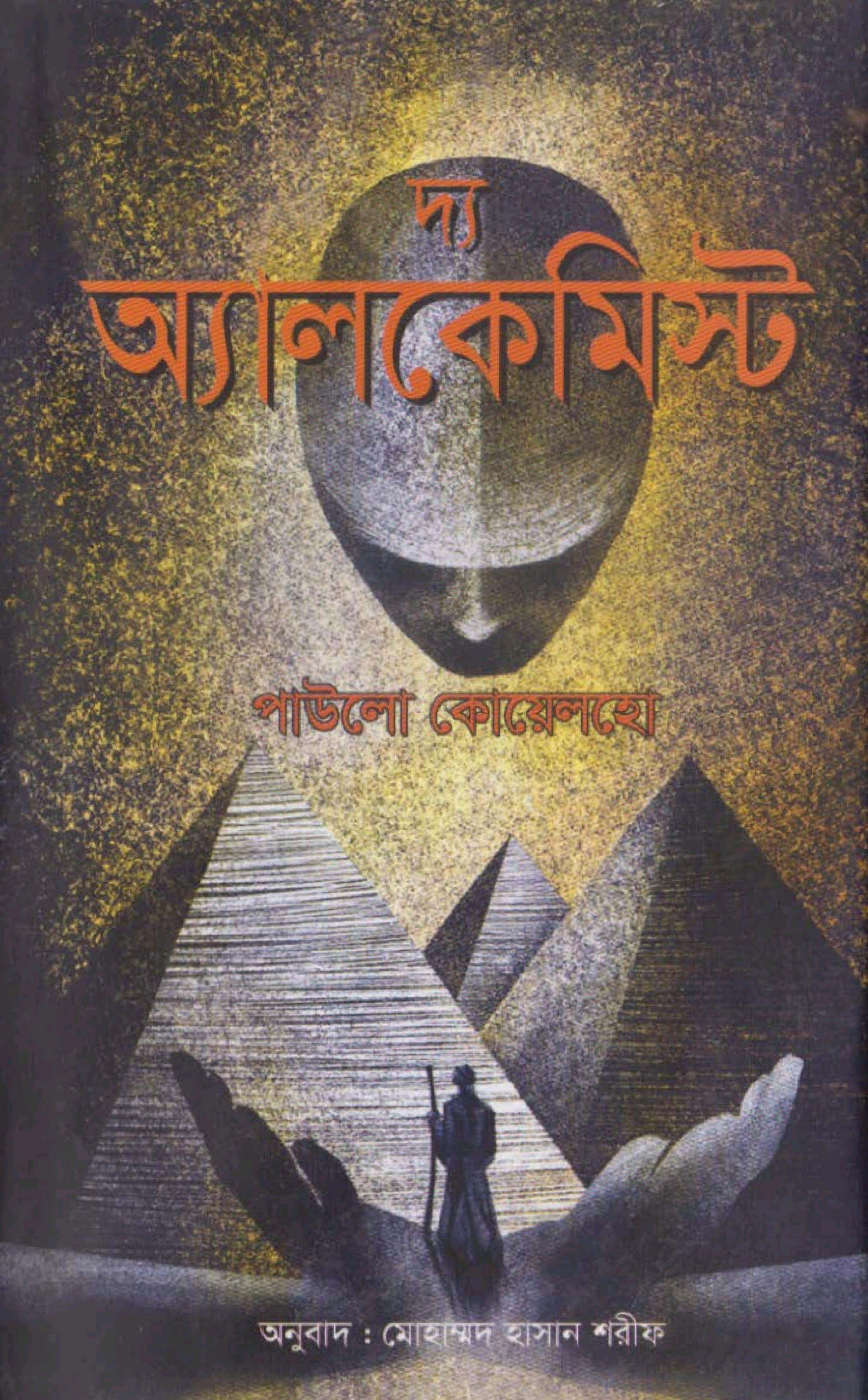


দ্য অ্যালকেমিস্ট

পাউলো কোয়েলহো

অনুবাদ : মোহাম্মদ হাসান শরীফ

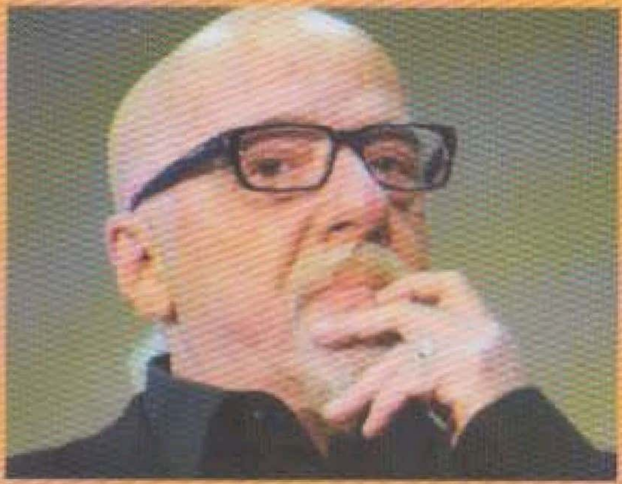


প্রতিটি মানুষের নিয়তি রয়েছে। তাকে ওই নিয়তির পথে চলতেই হবে। যে ওই পথে চলবে এবং চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতেই হবে। এই পথচলা ফুলবিছানো পথে হবে না। নানা সমস্যা আসবে, সেগুলো অতিক্রম করতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন যে ভালোবাসা, অন্তরাত্মার ডাকে এগিয়ে যাওয়ার পথে কোনো কিছুই বাধা নয়। আর এগিয়ে গিয়ে যে প্রাপ্তি হবে তা অনেক বেশি। তা এতই বেশি যে কল্পনাকেও হার মানাবে।

অ্যালকেমিস্ট ওই স্বপ্নপূরণের পথেই ছুটতে তাগিদ সৃষ্টি করে। প্রথমে জানতে হবে আমাদের মনের গভীরে থাকা স্বপ্নটি কী। তা জানা কঠিন কোনো কাজ নয়। একেবারে শৈশবেই স্বপ্নটি মানুষকে তাড়া করতে থাকে, স্বপ্নপথে ছুটতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কেউ কেউ বুঝে চলতে শুরু করে, কেউ বোঝেই না বা বুঝলেও নানা কষ্ট আর জটিলতার কথা ভেবে ঝুঁকি নিতে চায় না। তারা ব্যর্থই হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ কিছু দূর গিয়ে থমকে যায়, সামান্য প্রলোভনেই পথ হারায় বা পথ থেকে সরে যায়। সাময়িক আত্মতৃপ্তি সে পেলেও চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত হয় এবং তা তাকে বাকি জীবন তাড়া করতে থাকে। আর দুঃস্বপ্ন তার সব সুখ কেড়ে নেয়।

অ্যালকেমিস্ট আমাদের শেখায়, স্বপ্নপথে ছুটতে কোনো প্রতিবন্ধকতাই অজেয় নয়। যেকোনো বয়সে, যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোনো সময়ে মানুষ তার স্বপ্নের পথে চলতে পারে, নিয়তির কাছে পৌঁছাতে পারে। আর এর মাধ্যমেই তার জীবনকে সে স্বার্থক করতে পারে।

অ্যালকেমিস্টের স্বার্থকতাই এখানে। আর এ কারণেই বইটি বেস্ট সেলার।



পাউলো কোয়েলহো

ব্রাজিলের এই লেখক বিশ্ব মাতিয়ে চলেছেন। তার উপন্যাসগুলো ভেতরকে নাড়িয়ে দেয়, অবিশ্বাস্য রকমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পাঠককে তার বই নতুন জগতে নিয়ে যায়। পড়তে পড়তে মনে হবে, এ বইটিই তো দরকার ছিল এখন। তিনি যে বিশ্বব্যাপী বিপুলভাবে জনপ্রিয়, তার প্রথম প্রমাণ তার বইয়ের ব্যাপক চাহিদা। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো সামাজিক মাধ্যমগুলোতে তার উপস্থিতি। তার ফেসবুক ফ্যান প্রায় তিন কোটি, টুইটারে তার ফলোয়ার সোয়া কোটি।

জন্ম ১৯৪৭ সালে, এক ক্যাথলিক পরিবারে। বাবা চেয়েছিলেন, তিনি প্রকৌশলী হন। কিন্তু তিনি লেখক হওয়াকেই বেছে নিয়েছেন। একসময় তিনি ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন মুক্তির পথে বাধা মনে করে। আবার ফিরেও এসেছেন স্বাধীনতার পথে বাধা বিবেচনা না হওয়ায়।

তিনি সম্ভবত অ্যালকেমিস্ট উপন্যাসটির জন্যই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তার জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য পিলগ্রিমেজ, আলেফ, ভেরোনিকা ডিসাইডেস টু ডাই, দ্য জাহির, দ্য রিভার পেড্রা আই স্যাট অ্যান্ড উইপ্ট।

দ্য
অ্যালকেমিস্ট

দ্য
অ্যালকেমিস্ট

পাউলো কোয়েলহো

অনুবাদ

মোহাম্মদ হাসান শরীফ

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০১৯

প্রকাশক : মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
পরিবেশক : মিশু প্রকাশন, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : তাহমিদা জামান
কম্পোজ : অন্যধারা কম্পিউটার্স, ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ : একাত্তর প্রিন্টাস, ৪১/৪২, রূপচাঁন দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ২০০.০০ টাকা

The alchemist
by
Paulo Coelho

Published by: Md. Monir Hossain Pintu
ANYADHARA
38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100
Price: 200.00 Taka, Us $: 10 Dollar
ISBN: 978-984-93661-7-1

U.K Distributor n Sangeeta Limited
22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor n Muktadhara
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y.11372
Canada Distributor n Anyamela
300 Danforth Ave., Toronto (1st Floor) suite-202
Kolkata Distributor n Naya Udyog
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

বাংলা সংস্করণ উৎসর্গ

ফাতিমাকে
স্বপ্নের মানুষকে যে স্বপ্নের দিক
ছুটতে উদ্দীপ্ত করে

সূচি

এ অনুবাদ কেন?

বইটি পড়ামাত্র আমার মনে হয়েছে, এর বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। খোঁজ নিয়ে কোনো অনুবাদের সন্ধান পেলাম না। কেউ যদি কাজটি না করে থাকে, তবে কারো জন্য অপেক্ষায় না থেকে আমিই করি না কেন? শুরু করলাম। শেষ পর্যায়ে এসে জানতে পারলাম, একটি নয়, বেশ কয়েকটি অনুবাদ বাজারে রয়েছে। তার পরও শেষটুকুও শেষ করেছি। হয়তো এই চেষ্টা ওই সংখ্যাকেই একটু বড় করেছে মাত্র।

আরব বিজ্ঞানীদের লোহাকে সোনায় পরিণত করার সাধনা থেকে আলকেমির (কেমিস্ট্রি বা রসায়নশাস্ত্র) উৎপত্তি বলে জানা যায়। এটি আসলে সাধারণ জিনিসকে পরিশোধন করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। একইভাবে প্রতিটি মানুষের দায়িত্বও নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিশোধন করে সৃষ্টির সেরায় রূপান্তরিত করা। প্রত্যেককেই তার সাধ্যের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে, তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতেই হবে। পৃথিবীতে এটিই তার মিশন।

আলকেমিস্ট ওই প্রেরণাই সৃষ্টি করেছেন। কোনো মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, সে ছোট বা বড় যে পদেই অবস্থান করুক না কেন, স্বপ্নের ঠিকানায় যাওয়ার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। চলার পথে সামনে আসা সামান্য প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকার প্রলোভন দমন করতে হবে। অনেক সময় মনে হবে, বঞ্চিত হচ্ছি, সামনে বাড়লে কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাবে না। কিন্তু চলা অব্যাহত থাকলে শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া যাবে, তা কল্পনাকেও হার মানাবে।

এই বইটি হাতে এসেছিল দীন মোহাম্মদ ভাইয়ের সৌজন্যে। অনেক ব্যাপারেই তার ঋণ পরিশোধের কোনোই উপায় নেই। তিনিই আরো অনেক কিছুর মতো এ বইটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এমনকি এক কপি উপহারও দিয়েছিলেন। পড়ে আমার মনে হয়েছে, না পড়লে বড় কিছু মিস করতাম।

অনুবাদ কাজে সহকর্মী সাবরিনা সোবহানের কাছেও কৃতজ্ঞ থাকব। পরিমার্জনার কঠিন কাজে তার সর্বাত্মক সহায়তা, সহযোগিতা কখনো ভোলার নয়। এ ধরনের সহযোগিতা পেলে আরো বড় কাজও হাতে নেওয়া যায়।

বইটি অনুবাদে আরেকজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি হলেন বাকিবিল্লাহ। ধন্যবাদ। অনুবাদ করলেই তো হবে না, প্রকাশ করতে হবে। আমার প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করব কিনা যখন ভাবছিলাম, তখন তিনিই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাকে ধন্যবাদ।

তবে আরো সুন্দরভাবে বইটি প্রকাশ করার জন্য অন্যধারাকে ধন্যবাদ। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার যোগাযোগ কারেন আর্মস্ট্রংয়ের *জেরুসালেম : ওয়ান সিটি থ্রি ফেইথস* দিয়ে। আলকেমিস্টও তারা নতুনভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করায় খুশি হয়েছি।

লেখকের কথা

আমেরিকান প্রকাশক হার্পার কলিন্সের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার ঘটনাটি মনে পড়ছে। তিনি লিখেছিলেন : '*আলকেমিস্ট* পড়াটা এমন যে আমি ভোরে ঘুম থেকে ওঠে সূর্যোদয় দেখছি, আর বাকি দুনিয়া এখনো ঘুমিয়ে আছে।' আমি বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম : 'অর্থাৎ বইটির অনুবাদ হতে যাচ্ছে!' ওই সময় আমি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে, নিজের পথে চলতে হিমশিম খাচ্ছিলাম। অবশ্য তখনো সবাই আমাকে একসুরে বলছিল, অসম্ভব।

তারপর একটু একটু করে আমার স্বপ্ন ধরা দিতে শুরু করল। ১০, ১০০, ১০০০, ১০ লাখ কপি বিক্রি হলো আমেরিকায়। একদিন ব্রাজিলের এক সাংবাদিক আমাকে ফোন করে জানালেন, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আমার এ বইটি পড়া অবস্থায় ছবি প্রকাশ করেছেন। কয়েক দিন পর আমি তখন তুরস্কে, *ভ্যানিটি ফেয়ার* ম্যাগাজিন খুলে দেখতে পেলাম, জুলিয়া রবার্টস ঘোষণা করছেন, তিনি বইটি পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন। মিয়ামির রাস্তায় একাকী হাঁটার সময় শুনতে পেলাম, এক মেয়ে তার মাকে বলছে : 'তুমি অবশ্যই *আলকেমিস্ট* পড়বে!'

বইটি ৬১টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বিক্রি হয়েছে তিন কোটিরও বেশি কপি। লোকজন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে : এ ধরনের বিপুল সাফল্যের রহস্য কী? এর একমাত্র সত্য জবাব হলো : আমি জানি না। আমি যা জানি তা হলো, রাখালছেলে সান্তিয়াগোর মতো আমাদের সবারই দরকার নিজের অন্তরাত্মার আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

অন্তরাত্মার আহ্বান বলতে কী বুঝায়? তা হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পৃথিবীতে তোমার জন্য ঈশ্বর এ পথটিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা যখনই কিছু করি, তা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করলে বুঝতে হবে, আমরা আমাদের রূপকল্প অনুসরণ করছি। অবশ্য নিজের স্বপ্নের মুখোমুখি হওয়ার সাহস সবার নেই। কেন?

চারটি বাধা রয়েছে। প্রথমত : একেবারে শৈশব থেকেই আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা যা-ই করতে চাই না কেন, তা করা অসম্ভব। আমরা এই ধারণা নিয়ে বড় হই। সময় যত গড়াতে থাকে, বদ্ধমূল সংস্কার, ভীতি ও অপরাধবোধের আবরণ তত পুরু হতে থাকে। তারপর এমন একটা সময় আসে, যখন আন্তরাত্মার আহ্বান এত গভীরে চাপা পড়ে যায় যে তা আর দেখা যায় না। কিন্তু তখনো সে সেখানে থাকে।

আমাদের চাপা পড়া স্বপ্ন যদি খুঁড়ে বের করে আনার সাহস থাকে, তবে আমরা দ্বিতীয় বাধার মুখে পড়ি। সেটি হলো - ভালোবাসা। আমরা জানি, আমরা কী চাই। কিন্তু আমাদের স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে সবকিছু ত্যাগ করলে আমাদের

আশপাশে থাকা লোকজন কষ্ট পাবে মনে করে ভয় পাই। আমরা বুঝতে পারি না যে ভালোবাসা হলো স্রেফ আরেকটু গতিবেগের সঞ্চার। সেটা কোনোভাবেই আমাদের সামনে এগিয়ে চলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আমরা বুঝি না, যারা আন্তরিকভাবে আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, তারা আমাদের সুখী দেখতে চান, এই পথচলার সাথে থাকতে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

একবার যদি আমরা মেনে নেই যে, ভালোবাসা হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চালার ব্যাপার, তখন আমরা তৃতীয় বাধার মুখে পড়ি : চলার পথে সামনে আসা বাধার কাছে পরাজয়ের ভয়। আমরা যারা আমাদের স্বপ্নের জন্য লড়াই করি, তারা সফল না হলে বেশি কষ্টে পড়ি। কারণ আমরা সেই পুরনো অজুহাতটির আশ্রয় না নিয়ে পারি না : 'ওহ, আসলে এটা তো কামনা করিনি।' অথচ আমরা তা কামনা করি। এবং আমরা এও জানি, আমাদের সবকিছু এতে বাজি রেখেছি। আর অন্তরাত্মার আহ্বানের পথটি অন্য কোনো পথের চেয়ে সহজ নয়। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে অন্তরাত্মার আহ্বানের যে পথ তাতে আমাদের পুরো হৃদয় থাকে। এ কারণে আমাদেরকে অর্থাৎ আলোর যোদ্ধাদের অবশ্যই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরতে হবে, বুঝতে হবে, মহাবিশ্ব একযোগে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হয়তো আমরা তা বুঝতেও পারছি না।

আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি : পরাজয় কি অনিবার্য? আসলে অনিবার্য হোক বা না হোক, তবুও তা ঘটে। আমরা যখন প্রথম আমাদের স্বপ্নের জন্য লড়াই শুরু করি, তখন আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। ফলে অনেক ভুল করে ফেলি। তবে জীবনের একান্ত যে কথাটা আছে তা হলো, সাতবার ব্যর্থ হওয়ার পর অষ্টমবার ঘুরে দাঁড়ানো।

তাহলে আমরা আমাদের অন্তরাত্মার আহ্বান শুনে যদি অন্যদের চেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতেই হয়, তবে সেই পথ মাড়ানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ? খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একবার যদি আমরা পরাজয় থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারি, এবং আমরা সবসময় তা পারি, তবে আমরা প্রচণ্ডতম উল্লাস আর প্রবল আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠি। আমাদের হৃদয়ের শব্দহীনতায় আমরা বুঝতে পারি, আমরা জীবনের আশ্চর্য শক্তিতে নিজেদেরকে মূল্যবান হিসেবে প্রমাণ করেছি। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা কল্যাণকর লড়াইয়ের অংশ। আমরা প্রবল উদ্দীপনা আর আনন্দ নিয়ে বাঁচতে শুরু করি। যে দুর্ভোগ সহনীয় মনে হয়, তার চেয়ে অপ্রত্যাশিত যন্ত্রণা অনেক দ্রুত চলে যায়। সহনীয় দুর্ভোগটাই বছরের পর বছর টিকে থাকে, আমাদের নজরে না পড়েই তা আমাদের আত্মাকে বিনাশ করে দেয়। তারপর হয়তো একদিন তিক্ততা থেকে মুক্ত করার সামর্থ্য আর থাকে না, আমাদেরকে বাকি জীবন এর সাথেই থাকতে হয়।

আমাদের স্বপ্ন খুঁড়ে বের করে, একে পরিচর্যা করার জন্য ভালোবাসার শক্তিকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে এবং অনেক বছর ভীতি নিয়ে বেঁচে থেকে

হঠাৎ একদিন আমরা লক্ষ করি, আমরা সবসময় সেখানেই থাকতে চেয়েছি, আর ঠিক আগামী দিনই সেটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে - এমনটাই প্রত্যাশা করেছি। তারপর আসে চতুর্থ বাধা। সেটা হলো যে স্বপ্নকে ধরার জন্যই আমরা জীবনজুড়ে লড়াই করেছি সেই স্বপ্নকে গ্রহণ করার ভয়।

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন : 'প্রতিটি মানুষই তার ভালোবাসার জিনিসটাকে খুন করে ফেলে।' কথাটা সত্য। কাম্য বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ামাত্র সাধারণ মানুষের আত্মা অপরাধবোধে ভরে যায়। আমরা আশপাশে তাকিয়ে ওইসব লোককে দেখি, যারা তাদের কাম্য বস্তু অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তখন আমাদেরও মনে হতে থাকে, আমরাও ওই কাম্য বস্তুটি লাভ করার অধিকার রাখি না। আমরা যেসব বাধা অতিক্রম করে এসেছি, যত দুর্ভোগ ভোগ করেছি, এ পর্যন্ত যত ত্যাগ করেছি, সেই সবই ভুলে যা-ই। আমি এমন অনেক লোককে চিনি, যারা তাদের অন্তরের আহ্বান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল, লক্ষ্যে পৌঁছাতে মাত্র এক ধাপ দূরে ছিল, তখনই তারা বোকার মতো একটির পর একটি ভুল করে কখনোই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

এটিই সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ এর মধ্যে আনন্দ আর জয় পরিত্যাগ করার সন্ন্যাসসুলভ মায়াবি পরশ রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাস করেন, আপনি যে বস্তুটির জন্য লড়াই করেছেন, সেটি আপনার জন্য খুবই মূল্যবান, তবে আপনি হয়ে যাবেন ঈশ্বরের হাতিয়ার, আপনি জগতের আত্মাকে সহায়তা করবেন, এবং আপনি বুঝতে পারবেন - কেন আপনি এখানে।

পাউলো কোয়েলহো
রিও ডি জেনেরিও
নভেম্বর, ২০০২

মুখবন্ধ

কাফেলার কারো সাথে করে আনা একটি বই আলকেমিস্ট হাতে নিলেন। পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে নার্সিসাস নিয়ে একটি গল্প তার চোখে পড়ল।

নার্সিসাসের কাহিনীর সাথে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন আলকেমিস্ট। এক তরুণ নিজের সৌন্দর্য উপভোগ করতে একটি লেকের পাড়ে উবু হয়ে বসে থাকত। সে নিজের রূপে এতই বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল যে উবু হয়ে থাকতে থাকতে এক সকালে সে লেকে পড়ে ডুবে মারা গেল। যে জায়গাটিতে সে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে একটি ফুলের জন্ম হলো। এ ফুলকেই বলা হয় নার্সিসাস।

কিন্তু লেখক এখানেই গল্পটি শেষ করেননি।

তিনি লিখেলেন, নার্সিসাস যখন মারা গেল, তখন বনের দেবীরা এসে দেখলেন, টলটলে মিষ্টি পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ লেকটি এখন নোনা পানিতে ভরে গেছে।

'তুমি কাঁদছ কেন?' জানতে চাইলেন দেবীরা।

'নার্সিসাসের জন্য কাঁদছি,' লেক জবাব দিলো।

'আহ্, তুমি যে নার্সিসাসের জন্য কাঁদবে, তাতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই,' তারা বললেন। 'আমরা পর্যন্ত বনে তার পেছনে ছুটতাম। তবে একমাত্র তুমিই খুব কাছ থেকে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরেছিলে।'

'অ্যাঁ,... নার্সিসাস সুন্দর ছিল?' লেকটি জিজ্ঞেস করল।

'এ বিষয়টি তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?' অবাক হয়ে বললেন দেবীরা। 'কারণ, তোমার পাড়ে এসেই তো সে প্রতিদিন নিজের রূপে বিভোর হতো!'

কিছু সময় নীরব হয়ে রইল লেক। সবশেষে সে বলল :

'আমি নার্সিসাসের জন্য কাঁদছি। তবে নার্সিসাস সুন্দর ছিল কিনা তা আমি লক্ষ করিনি। কিন্তু আমি কাঁদি, কারণ প্রতিবার যখন পাড় থেকে আমার দিকে ঝুঁকত, তখন আমি তার চোখের গভীরে আমার নিজের রূপ প্রতিফলিত হতে দেখতাম।'

'কী সুন্দর গল্প,' আলকেমিস্ট ভাবলেন।



প্রথম খণ্ড

নাম তার সান্তিয়াগো। ভেড়ার পাল নিয়ে পরিত্যক্ত চার্চটির কাছে সে যখন পৌছাল, তখন চার দিকে ঘন অন্ধকার। অনেক আগেই চার্চের ছাদ ভেঙে পড়েছে। যেখানে একসময় পবিত্র বস্তুগুলো রাখা হতো, সেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক ডুমুরগাছ।

রাতটি সেখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো ছেলেটা। ভাঙা দরজা দিয়ে সব ক'টা ভেড়াকে ভেতরে ঢোকাল। তারপর সে নিজে ভেতরে প্রবেশ করল। কয়েকটি তক্তা আড়াআড়ি রেখে দরজা বন্ধ করে দিলো। এই এলাকায় নেকড়ে নেই। তবে কোনো ভেড়া রাতে যাতে ঘুরতে যেতে না পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। যদি কোনোটি একবার বের হতে পারে, তবে পরের সারাটি দিন যাবে সেটি খুঁজতে।

নিজের জ্যাকেট দিয়েই মেঝ ঝাড়ল সে। তারপর সবেমাত্র শেষ করা বইটিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে বলল - তাকে আরো মোটা বই পড়তে হবে : যত মোটা, তত টেকসই, বালিশ হিসেবে আরো আরামদায়ক।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। আধ-ভাঙা ছাদ দিয়ে ঝিলিমিলি তারা দেখা যাচ্ছিল।

আরেকটু ঘুমাতে পারলে ভালো হতো, ভাবল সে। এক সপ্তাহ আগে ঠিক এ স্বপ্নটিই দেখেছিল সে। তখনো স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই জেগে গিয়েছিল।

গাঝাড়া দিয়ে উঠল, লাঠি নিয়ে তখনো ঘুমিয়ে থাকা ভেড়াগুলোকে জাগাতে শুরু করল। লক্ষ্য করল, সে জেগে ওঠামাত্র বেশির ভাগ ভেড়াও পিট পিট করে তাকাতে শুরু করে দিয়েছে। দুই বছর ধরে সে ভেড়াগুলোর সাথে আছে। মনে হচ্ছে, কোনো এক রহস্যময় শক্তি ভেড়ার পালের সাথে তার জীবনকে জুড়ে দিয়েছে। আর সে খাবার আর পানির খোঁজে গ্রামের পথ বেয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'তারা আমার ব্যাপারে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আমার সময়সূচিও তারা জানে,' - বিড়বিড় করে বলল সে। এক মিনিট চিন্তা করে তার মনে হলো, বিষয়টি অন্য রকমও হতে পারে। সে নিজেই আসলে *তাদের* ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অবশ্য, কয়েকটি ভেড়ার ঘুম ভাঙতে কিছু বেশি সময় নেয়। ছেলেটা তার লাঠি দিয়ে সেগুলোকে একটি একটি করে খোঁচা দিতে লাগল, তবে প্রতিটির নাম ডেকে ডেকে। তার ধারণা, সে যা বলে ভেড়ারা বোঝে। তা-ই সে বই পড়তে পড়তে ভালো লাগা অংশগুলো মাঝে মাঝে তাদেরও শোনায়। সে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো রাখালের একাকিত্বের কথা বলে; তার সুখের কথা জানায়; অনেক সময় ছেড়ে আসা গ্রামে সে যা কিছু দেখেছে, সেগুলো সম্পর্কে তার অভিমত প্রকাশ করে।

তবে কয়েক দিন ধরে ভেড়াদেরকে সে কেবল একটি কথাই বলে চলেছে : ওই মেয়ের কথা। আর মাত্র চার দিন পর সে ওই মেয়ের গ্রামে যাবে ভেড়ার পশম বেচতে। সে মাত্র একবারই ওই গ্রামে গিয়েছিল। এক বছর আগে। মেয়েটির বাবা একটি মুদি দোকানের মালিক। বেশ চালাক। কেউ যাতে তাকে ঠকাতে না পারে, সেজন্য তার সামনেই ভেড়ার পশম ছাঁটতে হয়। এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়ে সে ভেড়াদের নিয়ে গিয়েছিল ওই দোকানির কাছে।

***

'আমি কিছু পশম বেচতে চাই,' - ছেলেটা বলেছিল দোকানিকে।

দোকানে তখন বড্ড ভিড়। লোকটি তাকে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। সময় কাটাতে সে দোকানের সিঁড়িতে বসে ব্যাগ থেকে বই বের করল।

'রাখাল বালকেরাও পড়তে পারে, আমার জানা ছিল না,' - একটি মেয়ে কথা বলে ওঠল তার পেছন থেকে।

মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আন্দালুসিয়া এলাকার। তার ঢেউ খেলানো কালো চুল আর চোখ দুটি অস্পষ্টভাবে মুরিশ বিজয়ীদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'আসলে কী, বইয়ের চেয়ে আমার ভেড়াগুলোর কাছ থেকেই অনেক বেশি শিখি,'- জবাব দিয়েছিল ছেলেটা। তারা দুই ঘণ্টা কথা বলেছিল। মেয়েটি জানিয়েছিল, ওই দোকানি তার বাবা। মেয়েটি তাদের গ্রামের গল্প করছিল, বলেছিল, এখানকার প্রতিটি দিনই অন্য দিনের মতো। রাখালবালক তাকে আন্দালুসিয়া এলাকার প্রান্তরগুলোর কথা শুনিয়েছিল। অন্য যেসব শহরে সে গেছে, সেখানকার কথা বলেছিল। ভেড়ার বদলে অন্য কারো সাথে কথা বলতে পারা ছিল খুব আনন্দের।

'তুমি কিভাবে পড়তে শিখছ?' মেয়েটি একপর্যায় জিজ্ঞাসা করেছিল।

'অন্য সবাই যেভাবে শেখে,' তার জবাব। 'স্কুলে।'

'আচ্ছা, তুমি যদি পড়তেই জানো, তবে এই রাখালগিরি করছ কেন?'

ছেলেটা বিড়বিড় করে কিছু একটি জবাব দিলো। এ করেই প্রসঙ্গ পাল্টাবার সুযোগ পেয়ে গেল। সে নিশ্চিত ছিল, মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারেনি। সে তার সফরনামা বলে চলল, আর মেয়েটির মুরিশ চোখ দুটি ভয় আর বিস্ময়ে বড় বড়

হয়ে উঠছিল। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটার মনে ততই ইচ্ছা জাগছিল, দিনটি যেন কোনোভাবেই শেষ না হয়, মেয়েটির বাবা যেন ব্যস্তই থাকেন, তাকে যেন তিনটি দিন অপেক্ষায় রাখেন। সে বুঝতে পারল, সে নিজের মধ্যে নতুন কিছু অনুভব করছে। জীবনে এই প্রথমবার এক স্থানে চির দিনের জন্য থেকে যাওয়ার বাসনা জেগেছিল মনে। ঝলমলে কালো চুলের মেয়েটি তাকে বদলে দিয়েছে। তার দিনগুলো আর কখনো আগের মতো হবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোকানি এসে পড়লেন। তিনি ছেলেটাকে চারটি ভেড়ার পশম ছাঁটতে বললেন। তিনি পশমের দাম দিয়ে আগামী বছরও তাকে আসতে বললেন।

***

আর চার দিন পর ওই গ্রামেই পৌঁছাবে সে। তার ভেতরে শিহরণ ছিল, একইসাথে অস্বস্তিও লাগছিল। প্রশ্ন জাগছিল, মেয়েটি কি তাকে ভুলে গেছে? অনেক রাখালই তো সেখানে যায় পশম বেচতে।

'ভুলে গেলে যাক গে, তাতে আমার কী আসে-যায়,' সে তার ভেড়াকে বলল। 'আমি নানা জায়গায় অনেক মেয়েকে চিনি।'

মুখে সে যা-ই বলুক না কেন, তার মন ঘুরপাঁক খাচ্ছিল মেয়েটিকে নিয়েই। মেয়েটিকে সে হারাতে চায় না। আর সে জানে, নাবিক আর হকারদের মতো রাখালরাও কোনো একটি শহরে এমন কাউকে খুঁজে পায়, যে তাদের বেপরোয়া ঘোরাঘুরির আনন্দ ভুলিয়ে দিতে পারে।

ভোর হচ্ছিল। ছেলেটা ভেড়াগুলোকে সূর্যের দিকে মুখ করে চালাতে লাগল। তার মনে হলো, ভেড়ারা কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। হয়তো এ কারণেই তারা সবসময় আমার খুব কাছে থাকে।

ভেড়াদের মাথায় থাকে কেবল খাবার আর পানির চিন্তা। ছেলেটা যত দিন আন্দালুসিয়ার সেরা প্রান্তরগুলোর কথা জানবে, তত দিন তারা তার বন্ধু থাকবে। তাদের দিনগুলো সবই একরকম, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় সীমাহীন সময়। তারা তাদের শৈশবে কখনো একটি বইও পড়েনি। শহরে যা যা দেখে ছেলেটা তাদের জানিয়েছে, তারা সেসবের কিছুই বুঝতে পারেনি। তারা কেবল খাবার আর পানির কথা ভেবেছে। বিনিময়ে তারা উদারভাবে পশম দিয়ে যাচ্ছে, আর দিচ্ছে সঙ্গ আর মাঝে মাঝে মাংস।

ছেলেটার ভাবল, আমি আজ একটি দৈত্য হয়ে তাদেরকে একটি একটি করে জবাই করতে থাকি, তবে কী হবে? মনে হয়, ভেড়াগুলোর বেশির ভাগই মারা যাওয়ার আগে বুঝতেই হয়তো পারবে না, তাদের জীবন শেষ হতে চলেছে। তারা আমাকে বিশ্বাস করে। আমি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করি বলেই তারা নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার বুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছে।

নিজের জ্ঞানী জ্ঞানী ভাবনায় হতবাক হয়ে গেল সে। যে চার্চে সে রাত কাটাল,

সেখানকার কিছু একটি তার ওপর আছর করেনি তো! এখানে থাকতে গিয়েই তো সে দ্বিতীয়বার স্বপ্নটি দেখল। আর তাতেই তার বিশ্বস্ত সঙ্গীদের ওপর রাগ জমলো। আগের রাতে খাবারের পর যে মদ রয়ে গিয়েছিল, সে তা থেকে সামান্য একটু পান করল। সে তার জ্যাকেটটি শরীরের সাথে আরো ভালো করে জড়িয়ে নিলো। সে জানে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে আসবে। তখন গরম এত পড়বে যে তার পক্ষে মাঠ দিয়ে চলা সম্ভব হবে না। গ্রীষ্মকালে দিনের এই সময় স্পেনের সবাই ঘুমিয়ে কাটায়। রাত না নামা পর্যন্ত তাপ থাকে। ওই পুরো সময় তাকে জ্যাকেটটি সাথে রাখতে হয়। গরমের সময় জ্যাকেটটির ওজন যখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তার মনে পড়ে, এ জ্যাকেটটিই ভোরের ঠাণ্ডা থেকে তাকে রক্ষা করে।

আমাদেরকে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, সে ভাবল। সাথে সাথেই জ্যাকেটটির ওজন আর উষ্ণতা তার কাছে স্বস্তিদায়ক মনে হলো।

জ্যাকেটটির একটি উদ্দেশ্য আছে, ঠিক যেমন আছে ছেলেটারও। তার জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঘুরে বেড়ানো। দুই বছর ধরে আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে সে এই অঞ্চলের সব শহর চিনে ফেলেছে। সে পরিকল্পনা করছে, এবার গিয়ে মেয়েটিকে বলবে, কিভাবে একটি সাধারণ রাখাল পড়তে শিখেছিল। ঘটনা হলো, সে ১৬ বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। তার মা-বাবা চেয়েছিলেন, তাদের ছেলে পাদ্রি হবে। সেটি হলে, তা হবে এই চাষী পরিবারের গর্বের কারণ। তারাও কেবল খাবার আর পানির জন্যই ভেড়ার মতো কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। সে ল্যাতিন, স্প্যানিশ আর ধর্মতত্ত্ব পড়েছে। কিন্তু একেবারে শৈশব থেকেই সে দুনিয়াকে জানতে চেয়েছে। ঈশ্বরকে জানা আর মানুষের পাপগুলো শেখার চেয়ে এটি তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। অনেক সাহসে ভর করে এক বিকেলে সে বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলল, সে পাদ্রি হতে চায় না। সে ঘুরে বেড়াতে চায়।

***

'বাবা, সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের এই গ্রাম দিয়ে পথ চলে,' - তার বাবা বলেছিলেন। 'তারা নতুন কিছুর খোঁজ করে। কিন্তু তারা যখন চলে যায়, তখন যেমন মানুষ হিসেবে এসেছিল, ঠিক তেমন মানুষ হিসেবেই ফিরে যায়। তারা প্রাসাদ দেখার জন্য পাহাড়ে চড়ে, কল্পনার ফানুস উড়িয়ে ভাবে, আগেকার দিন কতই না ভালো ছিল। তাদের ছিল সোনালি চুল, গাঢ় ত্বক। আসলে ঠিক এখন আমরা যেমন আছি, তারা তেমন লোকই ছিল।'

'কিন্তু শহরের যেসব প্রাসাদে তারা থাকত, আমি সেগুলো দেখতে চাই,' ছেলেটা বলেছিল।

'ওইসব লোক আমাদের এলাকা দেখে বলে, তারা এখানে সারা জীবন থাকতে চায়,' বাবা জবাব দিলেন।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাদের এলাকা দেখতে চাই, বুঝতে চাই তারা কিভাবে বাস করত,' ছেলে বলল।

'এখানে যারা আসে, তাদের কাছে খরচ করার মতো অনেক টাকা থাকে। এ কারণেই তারা ঘোরাফেরার ব্যয় মেটাতে পারে,' বাবা বলেছিলেন। 'আমাদের মধ্যে যারা রাখালগিরি করে, কেবল তারাই ঘুরে বেড়াতে পারে।'

'তাহলে আমি রাখালই হবো!'

বাবা আর কথা বলেননি। পর দিন তিনি ছেলেকে একটি থলেতে ভরে তিনটি প্রাচীন স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন।

'এগুলো একদিন মাঠে পেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, এগুলো হবে তোমার উত্তরাধিকারের অংশ। যাই হোক, এখন এগুলো দিয়ে একটি ভেড়ার পাল কিনে ফেলো। তারপর চলে যাও মাঠে। কোনো একদিন তুমি বুঝতে পারবে, এই পল্লীভূমি সেরা, আর আমাদের নারীরা সবচেয়ে সুন্দরী।'

তিনি ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। ছেলেটা তার বাবার চোখে ভালো করে তাকালে দেখতে পেত, সেখানেও রয়েছে দুনিয়া দেখার সক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা- ওই আকাঙ্ক্ষা তখনো সজীব ছিল, যদিও অনেক বছরের ব্যাপ্তিতে তাকে ওই আকাঙ্ক্ষা কবর দিতে হয়েছিল রোজকার খাবার, পানীয় আর প্রতি রাতে একই জায়গায় ঘুমানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য।

***

দিগন্ত রক্তিম হয়ে ওঠল, হঠাৎ করেই যেন মাথার ওপর হাজির হলো সূর্য। ছেলেটা তার বাবার সেই স্মৃতি মনে করে খুশি হলো। এর মধ্যেই সে অনেক দুর্গ দেখে ফেলেছে, অনেক নারীর সাক্ষাত পেয়েছে (যদিও তাদের কেউই, আর কয়েকটি দিন পর যার সাথে দেখা হওয়ার কথা রয়েছে, তার মতো নয়)। সে একটি জ্যাকেটের মালিক, একটি বই আছে। এ বইটি বদল করে আরেকটি পেতে পারে। আর আছে একপাল ভেড়া। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : প্রতিটি দিন সে তার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। আন্দালুসিয়ার মাঠ-ঘাট আর ভালো না লাগলে সে তার সব ভেড়া বিক্রি করে জাহাজও ধরতে পারে। এর মধ্যেই তার সাগর নিয়ে অনেক কিছু ভাবা হয়ে গেছে। অনেক নগরী, অসংখ্য নারী এবং খুশি হওয়ার অনেক সুযোগও সে জেনে গেছে। সূর্য উঠা দেখতে দেখতে ভাবল, গির্জায় গিয়ে ঈশ্বরকে আমি পেতাম না।

যখনই সে পারে, চেষ্টা করে নতুন পথে চলতে। আগে কখনোই সে ওই ভাঙ্গা চার্চে যায়নি, যদিও অনেকবারই সে এ এলাকার বিভিন্ন অংশে গেছে। দুনিয়াটা বিশাল, অফুরন্ত। তাকে কেবল যা করতে হয় তা হলো - ভেড়াগুলোকে পথে ঠেলে

দিয়ে দারুণ কিছু আবিষ্কারে বিভোর হয়ে যাওয়া। সমস্যা হলো- ভেড়াগুলো বুঝতেই পারে না, তারা প্রতিদিন নতুন পথে হাঁটছে। তারা দেখে না, মাঠগুলো নতুন, মওসুম বদলে গেছে। তারা কেবল খাবার আর পানি নিয়েই ভাবে।

হয়তো আমরা সবাই এরকমই, ছেলেটার মনে হলো। এমনকি আমিও তো মুদি দোকানির মেয়েকে দেখার পর আর কোনো নারীর কথা ভাবছি না। সূর্যের দিকে তাকাল সে। হিসাব করে দেখল, দুপুরের আগে তারিফায় পৌঁছানো সম্ভব। সেখানে তার বইটি বদলে আরো ভারী একটি নিতে পারবে, বোতলে মদ ভরতে পারবে, চুল-দাড়ি কামিয়ে মেয়েটির সাথে দেখা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। সে ভাবতে চাইল না যে তার আগেই হয়তো অন্য কোনো রাখাল আরো বেশি ভেড়া নিয়ে ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য সেখানে পৌঁছে গেছে।

তার ভাবনায় এলো, এটা খুবই সম্ভব যে একটি স্বপ্ন সত্যি হয়ে জীবনকে সুন্দর করে দেবে। সে সূর্য কত দূর উঠল তা দেখে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎই তার মনে পড়ল, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন এমন এক বৃদ্ধা থাকেন তারিফায়।

***

ওই নারী তার বাড়ির পেছনের একটি কামরায় নিয়ে গেলেন ছেলেটাকে। রঙিন পুঁতির একটি পর্দা দিয়ে বসার ঘর থেকে আলাদা করা কামরাটি। এখানে আছে একটি টেবিল, দুটি চেয়ার আর 'যিশুর পবিত্র হৃদয়ের' একটি ছবি।

বৃদ্ধা নিজে বসলেন, ছেলেটাকে বসতে বললেন। তারপর তার দুই হাত টেনে নিয়ে শান্তভাবে মন্ত্র জপতে লাগলেন।

বৃদ্ধাকে দেখে জিপসিদের কথাই তার মনে পড়তে লাগল। পথেঘাটে জিপসিদের সাথে তার অনেকবার দেখা হয়েছে। তারাও ঘুরে বেড়ায়, তবে তাদের ভেড়ার পাল নেই। মানুষজন বলে, জিপসিরা অন্যদের ঠকিয়ে জীবন চালায়। এমনও বলা হয়, শয়তানের সাথে তাদের যোগসাজশ আছে, তারা শিশুদের অপহরণ করে তাদের গুপ্ত আস্তানায় নিয়ে গিয়ে দাস বানিয়ে রাখে। ছোটকালে ছেলেটা ভয় পেত জিপসিদের হাতে বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণকে। এই বৃদ্ধা তার হাত দুটি টেনে নিলে শৈশবের সেই ভয় এসে গ্রাস করল।

তবে সে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল এই বলে যে এই নারীর কাছে 'যিশুর পবিত্র হৃদয়' আছে। সে চাচ্ছিল না, তার হাত দুটি কাঁপতে থাকুক। কারণ তাতে এই বুড়ো নারী জেনে যাবেন, সে ভয় পাচ্ছে। সে মনে মনে বাইবেলের কিছু কিছু অংশ আওড়াতে থাকল।

'দারুণ তো,' তিনি বললেন, ছেলেটার হাত দুটি এক পলকের জন্যও না ছেড়ে। তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

ছেলেটা নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। তার হাত কাঁপতে লাগল, বৃদ্ধা তা টের পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি হাত দুটি ছেড়ে দিলেন।

'আপনি আমার হস্তরেখা পড়বেন, সেজন্য আমি এখানে আসিনি,' সে বলল। এখানে আসার জন্য এর মধ্যেই তার মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়েছে। তার একবার মনে হলো, দু'বার দেখা স্বপ্নটিকে সে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। এ সম্পর্কে কিছু না জেনে কেবল ফি দিয়ে কেটে পড়াই ভালো।

'তুমি এসেছ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনতে,' বৃদ্ধা বললেন। 'আর স্বপ্ন হলো ঈশ্বরের ভাষা। তিনি যখন আমাদের ভাষায় কথা বলেন, তখন আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, তিনি কী বলেছেন। তবে তিনি যদি আত্মার ভাষায় বলে থাকেন, তবে তা কেবল তুমিই বুঝতে পারবে। তবে তা যা-ই হোক না কেন, পরামর্শের জন্য আমি তোমার কাছে ফি চাইছি।'

আরেকটি চালাকি, ছেলেটা ভাবল। তবে একটি সুযোগ নিতে চাইল সে। রাখাল সবসময় নেকড়ে, খরা থেকে সুযোগ নেয়, এগুলোই রাখাল-জীবনকে রোমাঞ্চকর করে তোলে।

'আমি এই একই স্বপ্ন দু'বার দেখেছি,' সে বলল। 'আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি আমার ভেড়ার পাল নিয়ে একটি মাঠে অবস্থান করছি। এমন সময় একটি শিশু এসে ভেড়াগুলোর সাথে খেলতে শুরু করল। কেউ এমন কিছু করুক, তা আমি চাই না। কারণ নতুন কাউকে দেখলে ভেড়ারা ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু শিশুরা মনে হয় সবসময় তাদেরকে ভয় না পাইয়েই তাদের সাথে খেলা করতে পারে। কেন তারা পারে, আমি বলতে পারি না। ভেড়ারা মানুষের বয়স কিভাবে বোঝে, তা-ও জানি না।'

'তোমার স্বপ্ন সম্পর্কে আমাকে আরো কিছু বলো,' বৃদ্ধ বললেন। 'আমি রান্না ফেলে এসেছি। তোমার কাছে তো বেশি টাকা-পয়সা নেই। তাই আমি তোমাকে বেশি সময় দিতে পারব না।'

'শিশুটি আমার ভেড়াগুলোর সাথে অনেকক্ষণ খেলা করল,' ছেলেটা বলে চলল, একটু কষ্টস্বরে। 'তারপর হঠাৎ, শিশুটি আমার দুই হাত ধরে আমাকে মিসরের পিরামিডে নিয়ে গেল।'

একটু দম নিলো ছেলেটা, ওই নারী মিসরের পিরামিড চেনেন কিনা জানার জন্য। তিনি কিছুই বললেন না।

'তারপর, মিসরের পিরামিডে,' শব্দ তিনটি বলল সে খুবই ধীর লয়ে, যাতে বৃদ্ধা বুঝতে পারেন - "শিশুটি আমাকে বলল, 'এখানে এলে গুপ্তধন খুঁজে পাবে।' আর যে মুহূর্তে সে আমাকে ঠিক জায়গাটি দেখিয়ে দিতে যাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে গেল। দু'বারই।"

বৃদ্ধা কিছু সময় নীরব থাকলেন। তারপর আবার ছেলেটার হাত টেনে নিলেন, সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

'আমি ঠিক এখনই তোমার কাছ থেকে ফি নিচ্ছি না,' তিনি বললেন। 'তবে তুমি যদি গুপ্তধন খুঁজে পাও, আমি তার দশ ভাগের এক ভাগ চাই।'

ছেলেটা হাসল, খুশিতে ডগমগ করে ওঠল। যাক বাবা, যে সামান্য ক'টা টাকা আছে, গুপ্তধন নিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে তা আর হাতছাড়া হচ্ছে না!

'ঠিক আছে, তাহলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করুন,' সে বলল।

'প্রথমে আমার কাছে ওয়াদা করো। আমি যা এখন বলব তার বিনিময়ে তোমার পাওয়া গুপ্তধনের দশ ভাগের এক ভাগ আমাকে দেবে।'

রাখাল ছেলে ওয়াদা করল, সে দেবে। বৃদ্ধা আবার তাকে ওয়াদা করতে বললেন 'যিশুর পবিত্র হৃদয়ের' ছবির দিকে তাকিয়ে।

'এ স্বপ্নটি দুনিয়ার ভাষায়' বৃদ্ধা বললেন। 'আমি এর ব্যাখ্যা করতে পারব। তবে ব্যাখ্যাটি খুবই জটিল। এ কারণে আমি মনে করছি, তুমি যা পাবে, তাতে আমার অংশ প্রাপ্য আছে।'

'আর আমার ব্যাখ্যা হলো - তুমি অবশ্যই মিসরের পিরামিডে যাবে। আমি ওগুলোর নাম কখনো শুনিনি, তবে কোনো শিশু তোমাকে সেগুলো দেখিয়ে থাকলে, সেখানে অবশ্যই গুপ্তধন অবশ্যই আছে। সেখানে তুমি গুপ্তধন পেয়ে ধনী হয়ে যাবে।'

ছেলেটা বিস্ময়ে হা হয়ে গেল। তারপর বিরক্ত হলো। এসব কথা শোনার জন্য তার এই বৃদ্ধার কাছে আসার দরকার ছিল না! অবশ্য তার সাথে সাথে মনে পড়ল, এই বৃদ্ধাকে তার কিছুই দিতে হবে না।

'এই কাজে অপচয় করার মতো সময় আমার নেই,' সে বলল।

'আমি তোমাকে বলেছি, তোমার স্বপ্নটি ছিল খুবই কঠিন। জীবনের সবচেয়ে ব্যতিক্রম ঘটনাকে মনে হতে পারে একেবারে সহজ বিষয়। কেবল জ্ঞানী লোকেরাই ওই সহজ ঘটনার আসল ব্যাখ্যা বুঝতে পারে। তবে আমি জ্ঞানী নই। আর তা-ই আমাকে হস্তরেখা বোঝার জন্য অন্য অনেক কিছু শিখতে হয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমি কিভাবে মিসর যাব?'

'আমি কেবল স্বপ্নের ব্যাখ্যা করি। সেগুলো কিভাবে বাস্তবে পরিণত হবে, জানি না। আর এ কারণেই আমার মেয়েরা আমাকে যতটুকু খাবার খেতে দেয়, আমি তা খেয়েই কোনোমতে বেঁচে আছি।'

'আর আমি যদি মিসর না যাই?'

'তবে আমি ফি পাবো না, এমনটি আরো অনেকবার হয়েছে।'

তারপর বৃদ্ধা তাকে চলে যেতে বললেন। এর মধ্যেই তার অনেক সময় অপচয় হয়ে গেছে।

এতে ছেলেটা হতাশ হলো; সে সিদ্ধান্ত নিলো, আর কখনো সে স্বপ্নে বিশ্বাস করবে না। তার মনে পড়ল, তার অনেক কিছু করার আছে। প্রথমে বাজারে গেল কিছু খেতে, তার বইটি বদলিয়ে আরো মোটা একটি নিলো। তারপর বাজারের একটি বেঞ্চ দেখতে পেয়ে সেদিকে গেল। এখানে বসে সে তার কেনা নতুন মদের স্বাদ চেখে দেখতে পারে। গরমের দিন। তবে মদ সব ক্লান্তি দূর করে দিলো।

ভেড়াগুলো সে নগরীর ফটকের কাছে তার বন্ধুর খোঁয়াড়ে রেখে এসেছে। এই শহরের অনেককে সে চেনে। যেখানেই সে যায়, অনেককেই বন্ধু বানিয়ে নিতে পারে। ফলে তাকে সবসময় তাদের কাছে থাকতে হয় না। এটিই সফরকে তার কাছে আবেদনময় করে তোলে। কেউ যখন প্রতিদিন একই লোকজন দেখে, ঠিক যেমন তার হয়েছিল গির্জার স্কুলে, তখন তারা ওই লোকের ব্যক্তিগত জীবনের অংশ হয়ে পড়ে। আর তখন তারা চায়, লোকটি বদলে যাক। কেউ যখন অন্যদের চাওয়া মতো না হতে চায়, তখন অন্যরা ক্রুদ্ধ হয়। সবারই মনে হয় স্পষ্টভাবে জানে, অন্যদের কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত। তারা সে পরামর্শও দেয়। কিন্তু কেউই তার নিজের জীবন কিভাবে চালানো উচিত, ওই পরামর্শ কারো কাছ থেকে শুনতে চায় না।

সূর্য একটু ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। তারপর সে তার ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠ দিয়ে এগিয়ে যাবে। এখন থেকে তিন দিন পর সে দোকানির মেয়েটির কাছে যেতে পারবে।

সে কিনে আনা বইটি পড়তে শুরু করল। এর একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে কবর দেওয়ার অনুষ্ঠানের বর্ণনা। এতে অংশ নেওয়া লোকজনের নাম এত কঠিন যে উচ্চারণ করাই দায়। ভাবল, সে যদি কখনো বই লেখে, তবে বর্তমান সময়ের লোকজনের নাম ব্যবহার করবে, যাতে পাঠককে অনেক নাম মনে রাখা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে না হয়।

অনেক চেষ্টার পর সে যেই মাত্র পড়ায় মনোযোগ দিতে পারল, তখনই বইটি তার ভালো লাগতে শুরু করল। কবর দেওয়ার অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এক বরফ-পড়া দিনে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভবটি দারুণ মনে হলো। তার পড়ার মধ্যেই এক বুড়ো লোক এসে তার পাশে বসলেন, সাথে সাথে আলাপ জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'এখানে তারা কী করছে?' বাজারের লোকজনকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'কাজ করছে,' ছেলেটা বলল কঠিনভাবে। ভাব দেখাল, কথা বলার ইচ্ছা নেই, সে চাচ্ছে বই পড়ায় মনোযোগ দিতে।

আসলে সে দোকানির মেয়ের সামনে বসে তার ভেড়ার পশম ছাঁটার কথা কল্পনা করছিল। সে ভাবছিল, মেয়েটির সামনে গিয়ে সে এমন ভাব ধরবে যে মনে হবে সে বিরাট কেউ। অবিশ্বাস্য সব কাণ্ডকারখানা সে করে দেখাতে পারে। সে অনেকবারই এ ধরনের দৃশ্য কল্পনা করেছে। সে মনে মনে দেখেছে, প্রতিবারই মেয়েটি অবাক হয়ে গেছে এটা শুনে যে ভেড়ারা পছন্দ করে পশম পেছন থেকে সামনের দিকে ছাঁটতে। তার ভেড়ার পশম ছাঁটার সময় বলার জন্য বেশ কিছু ভালো গল্পও সে মনে রাখার চেষ্টা করেছে। এসব গল্পের বেশির ভাগেই সে বইতে পড়েছে। কিন্তু ঠিক করে রেখেছে, সে এমনভাবে বলবে, যাতে মনে হয়, এসব তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মেয়েটি তার বানানো গল্প বুঝতেই পারবে না। কারণ সে তো পড়তে জানে না।

বুড়ো লোকটি কিন্তু কথা চালিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন, তিনি ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। তিনি ছেলেটার কাছে জানতে চাইলেন, তার কাছে এক চুমুক মদ হবে কি-না। ছেলেটা তার বোতলটি বাড়িয়ে দিলো। আশা করল, এবার হয়তো লোকটি তাকে একা থাকতে দেবেন।

কিন্তু বুড়ো লোকটি আলাপ জমাতে চাইলেন। তিনি ছেলেটার কাছে জানতে চাইলেন, সে কী বই পড়ছে। ছেলেটার রাগ হলো, চাইল অন্য বেঞ্চে চলে যেতে। কিন্তু তার বাবা তাকে বয়স্কদের প্রতি সম্মান দেখাতে শিখিয়েছেন। তাই সে তার হাতে ধরা বইটি বুড়োর হাতে দিলো - দুটি কারণে : প্রথমত, বইটির নামের উচ্চারণ নিয়ে তার নিজেরই দ্বিধা ছিল; এবং দ্বিতীয়ত, লোকটিও যদি পড়তে না পারেন, তবে লজ্জিত হয়ে নিজে থেকেই অন্য বেঞ্চে চলে যাবেন।

'হুমম...' বললেন বুড়ো লোকটি। তিনি বইটি উল্টে পাল্টে এমনভাবে দেখলেন যেন এটি আশ্চর্য বস্তু। 'এটি গুরুত্বপূর্ণ বই, তবে আসলেই খিটমিটে।'

ছেলেটা বড় একটি ধাক্কা খেল। বুড়ো লোকটি পড়তে জানেন, এবং আগেই বইটি পড়ে ফেলেছেন। বইটি যদি খিটমিটেই হয়ে থাকে, যেভাবে বুড়ো লোকটি বললেন, ছেলেটার হাতে এটি বদলানোর সময় এখনো আছে।

'দুনিয়ার প্রায় সব বই যা বলে, এখানেও তা বলা হয়েছে,' বললেন বুড়ো লোকটি। 'এতে বলা হয়েছে, মানুষ তাদের নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আর শেষ করা হয়েছে এই বলে যে প্রত্যেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যায় বিশ্বাস করে।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যাটা কী?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, একেবারে অবাক হয়ে।

'এটি হলো এই : আমাদের জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমরা ভাগ্যের পুতুল হয়ে যাই। এটিই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যা।'

'আমার বেলায় এমন কখনো হবে না,' ছেলেটা বলল। 'তারা আমাকে পাদ্রি বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাখাল হওয়া বেছে নিয়েছি।'

'খুব ভালো,' বললেন বুড়ো লোকটি। 'কারণ তুমি বেড়াতে ভালোবাসো।'

'তিনি জানেন আমি কী ভাবছি,' ছেলেটা মনে মনে বলল। বুড়ো লোকটি এর মধ্যেই দ্রুততার সাথে বইটির পাতা উল্টাতে লাগলেন; মনে হচ্ছিল না, তিনি আদৌ বইটি ফেরত দিতে চান। ছেলেটা লক্ষ করল, লোকটির পোশাক বেশ অদ্ভুত। তাকে আরব আরব মনে হচ্ছিল। এসব এলাকায় আরবদের দেখা যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তারিফা থেকে আফ্রিকা মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। কেবল নৌকায় করে একটি সরু খাড়ি পাড়ি দিলেই চলে। আরবরা প্রায়ই এই নগরীতে আসে, কেনাকাটা করে, দিনে কয়েকবার উদ্ভটভাবে প্রার্থনা করে।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক জায়গা থেকে।'

'একজন অনেক জায়গা থেকে আসতে পারে না,' ছেলেটা বলল। 'আমি রাখাল, আমি অনেক স্থানে যাই, কিন্তু আমি এসেছি কেবল একটি জায়গা থেকে - একটি প্রাচীন দুর্গের কাছে থাকা নগরী থেকে। আমি সেখানেই জন্ম নিয়েছি।'

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে বলতে পারি, আমি সালেমে জন্মগ্রহণ করেছি।'

ছেলেটা জানে না, সালেম কোথায়। তবে তাকে মূর্খ ভাবতে পারে, এজন্য সে জিজ্ঞাসাও করল না যে সালেম কোথায়। সে একনজরে দেখে নিলো বাজারের লোকজনকে। তারা আসছে, যাচ্ছে। সবাইকে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত।

'আচ্ছা, সালেম দেখতে কেমন?' কিছু ক্লু পাওয়ার চেষ্টা করল সে।

জবাব এলো, 'সবসময় যেমন থাকে, তেমনই।'

এখনো কোনো ক্লু পাওয়া গেল না। তবে সে জানে, সালেম বলে কোনো জায়গা আন্দালুসিয়ায় নেই। থাকলে সে অনেক আগেই এর নাম শুনত।

'সালেমে আপনি কী করেন?' সে জোর দিয়ে জানতে চাইল।

'আমি কী করি?' তিনি হাসলেন। 'শোনো, আমি সালেমের রাজা!'

মানুষজন তো কত আবোল-তাবোল বকে, ছেলেটা ভাবল। এসব লোকের চেয়ে ছাগল-ভেড়া ভালো, ওগুলো কোনো কথাই বলে না। আরো ভালো হয় বইপত্র নিয়ে থাকা। তুমি যখনই চাইবে, বই পছন্দমতো অবিশ্বাস্য অনেক গল্প বলবে। কিন্তু লোকজনের সাথে কথা বলার সময়, তারা এমন কিছু বলে, যাতে করে তুমি বুঝতেও পারবে না, কিভাবে আলাপ চালিয়ে নেবে।

'আমার নাম মেলচিজেদেক,' বুড়ো লোকটি বললেন। 'তোমার কয়টি ভেড়া আছে?'

'অনেক,' ছেলেটার জবাব। সে বুঝতে পারল, বুড়ো লোকটি তার জীবন সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চান।

'তবে তো আমরা সমস্যায় পড়ে গেলাম। তুমি যদি মনে করো, তোমার যথেষ্ট ভেড়া আছে, তবে তোমাকে সাহায্য করার কিছু নেই।'

ছেলেটা অস্বস্তিতে পড়ল। সে তো সাহায্য চায়নি। এই বুড়োই তার কাছে তার মদ চেয়ে পান করতে চেয়েছেন। তিনিই আলাপ শুরু করেছেন।

'আমার বইটি ফেরত দিন,' ছেলেটা বলল। 'আমাকে ভেড়াগুলো জড়ো করতে হবে, উঠতে হচ্ছে।'

'তোমার ভেড়াগুলোর দশ ভাগের এক ভাগ আমাকে দাও, আমি তোমাকে বলে দেব, গুপ্তধন কিভাবে পাবে,' বললেন বুড়ো লোকটি।

স্বপ্নের কথা মনে পড়ল ছেলেটার। সাথে সাথেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। বৃদ্ধা তার কাছে নগদ কিছু চাননি। হয়তো এই লোকটি তার স্বামী। তিনি অস্তিত্বহীন গুপ্তধনের কথা বলে তার কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই বুড়ো লোকটিও হয়তো ওই বৃদ্ধা নারীর মতো জিপসি।

তবে ছেলেটা কিছু বলার আগেই বুড়ো লোকটি ঝুঁকে তার হাতের লাঠি দিয়ে বাজারের বালি-মাটির মধ্যে কিছু লিখতে শুরু করে দিলেন। তার বুক থেকে উজ্জ্বল কিছু প্রতিফলিত হলো। এর তীব্রতা এত ছিল যে মুহূর্তের জন্য ছেলেটার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি খুব দ্রুত কাজটি করলেন। এমন বয়সে এভাবে কিছু করা অস্বাভাবিক। তিনি তার হাতাকাটা জামার ভেতরে থাকা আলো ছড়ানো জিনিসটি ঢেকে ফেললেন। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে এলে ছেলেটা বালিতে বুড়ো লোকটির লেখা পড়তে পারল।

সেখানে, ওই ছোট্ট নগরীর বাজারের বালিমাটিতে, তার বাবা, মা আর যে স্কুলে সে পড়েছে, সেসবের নাম লেখা রয়েছে। এমনকি ওই যে মুদি দোকানির মেয়ে, তার নামও আছে। এ মেয়েটির নাম তো সে নিজেও জানত না। এমন সব কথাও লেখা আছে, যা সে কোনো দিন কাউকে বলেনি।

***

'আমি সালেমের রাজা,' বুড়ো লোকটি আবার বললেন।

'আপনি রাজা হলে একটি রাখালছেলের সাথে কথা বলছেন কেন?' ছেলেটা জানতে চাইল সম্ভ্রমে ও অস্বস্তিতে।

'অনেক কারণে। তবে আমি বলছি, সবচেয়ে বড় কারণ হলো, তুমি তোমার নিয়তি খুঁজে পাওয়ার অভিযানে সফল হতে যাচ্ছ।'

ছেলেটা জানে না, মানুষের 'নিয়তি' আসলে কী।

'তুমি সবসময় এমনটিই করতে চেয়েছ। মানুষ যখন ছোট থাকে, তখন তারা সবাই ভালোভাবে জানে তাদের নিয়তি কী।'

'তাদের জীবনের ওই পর্যায়ে, সবকিছুই থাকে স্পষ্ট, তখন সবকিছুই সম্ভব। স্বপ্ন ভয় পায় না তারা, জীবনে যা কিছু ঘটতে পারে বলে আশা করে, মনেপ্রাণে চায়, সেই সবই যেন ঘটে। তবে সময় যত গড়ায়, একটি রহস্যময় শক্তি বোঝায়, তাদের নিয়তিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া তাদের জন্য অসম্ভব।'

বুড়ো লোকটি যা কিছু বলেছেন, সেগুলোর প্রায় কোনো কিছুই ছেলেটা বুঝতে পারল না। তবে ওই 'রহস্যময় শক্তি' সম্পর্কে জানার আগ্রহ হলো তার। এই শক্তি নিয়ে কিছু বলতে পারলে দোকানির মেয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে!

'এটি এমন শক্তি, যা নেতিবাচক মনে হবে। কিন্তু আসলে এই শক্তিই তোমাকে দেখিয়ে দেবে, তুমি কিভাবে তোমার নিয়তিকে বাস্তবে পরিণত করতে পারবে। এই শক্তিই তোমার মধ্যে উদ্দীপনা ও তোমার ইচ্ছাকে প্রস্তুত করে। তাছাড়া এই গ্রহে একটি পরম সত্য আছে : তুমি যে-ই হও না কেন, কিংবা তুমি যে কাজেই লেগে থাকো না কেন, তুমি যখন সত্যিই কিছু করতে চাও, এই কামনার কারণ হলো এই ইচ্ছার সৃষ্টি হয়েছে মহাজগতের আত্মা থেকে। দুনিয়ায় এটিই তোমার মিশন।'

‘এমনকি কেউ যখন কেবল ঘুরে বেড়াতে চায়? কিংবা দোকানির মেয়েকে বিয়ে করতে চায়?’

‘হ্যাঁ, কিংবা এমনকি যখন গুপ্তধনের সন্ধানও করে। জগতের আত্মা পরিপুষ্ট হয় লোকজনের সুখ থেকে। আবার অসুখী অবস্থা, ঈর্ষা ও হিংসা থেকেও হয়। নিজের নিয়তিকে বাস্তবে পরিণত করাটা সেই লোকের প্রকৃত বাধ্যবাধকতা। আলাদা আলাদা মনে হলেও আসলে সবকিছুই এক।

‘এবং, কেউ মনে-প্রাণে কিছু করতে চাইলে তাকে সহযোগিতা করতে পুরো মহাবিশ্ব একযোগে এগিয়ে আসে।’

তারা দুজনেই কিছু সময়ের জন্য নীরব থাকলেন, বাজার ও নগরের লোকজন দেখলেন। বুড়ো লোকটাই প্রথমে কথা বললেন।

‘তুমি কেন ভেড়া চড়াতে চাও?’

‘কারণ আমি ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি।’

বাজারের এক কোণায় থাকা ফাস্ট ফুডের দোকানটি দেখালেন বুড়ো লোকটি। দোকানদার তার দোকানের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ‘ওই লোকটি যখন শিশু ছিলেন, তখন তিনিও ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবতেন। কিন্তু বেড়াতে বের হওয়ার আগে তিনি প্রথমে তার ফাস্ট ফুডের দোকান দিতে চাইলেন। কিছু টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন। ঠিক করেছিলেন, বুড়ো বয়সে তিনি এক মাসের জন্য আফ্রিকা যাবেন। তিনি কখনো বুঝতে পারেননি, মানুষ তাদের জীবনের যেকোনো সময় তার যে স্বপ্নই হোক না কেন, পূরণ করতে সক্ষম।’

‘তার উচিত ছিল রাখাল হওয়া,’ ছেলেটা বলল।

‘হ্যাঁ, তিনিও এমনটা ভেবেছিলেন,’ বললেন বুড়ো লোকটি। ‘কিন্তু ফাস্ট ফুডের ব্যবসায়ীরা রাখালদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লোক বিবেচিত হয়। ফাস্ট ফুডের ব্যবসায়ীদের বাসা আছে, কিন্তু রাখালদের ঘুমাতে হয় খোলা জায়গায়। মা-বাবা চায়, তাদের মেয়েরা রাখালদের বাদ দিয়ে যেন ব্যবসায়ীদের বিয়ে করে।’

ছেলেটা তার বুকে হঠাৎ প্রচণ্ড ধুপ শব্দ টের পেলো। দোকানির মেয়ের কথা মনে পড়ল। ওই মেয়ের শহরে নিশ্চয় কোনো ফাস্টফুড ব্যবসায়ী আছে।

বুড়ো বলে চললেন, ‘তবে দীর্ঘ মেয়াদে লোকজনের কাছে তাদের নিজেদের নিয়তির বদলে রাখাল কিংবা ব্যবসায়ীরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।’

বুড়ো বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টিয়ে চলেছেন, হঠাৎ কোনো কোনো পাতার লেখা পড়ে ফেলছেন। ছেলেটা অপেক্ষা করতে থাকল। তারপর তার মনোযোগ ছিন্ন করল, ঠিক যেভাবে বুড়ো লোকটি তার মনোযোগ ছিন্ন করেছেন। ‘আপনি কেন আমাকে এসব বলছেন?’

‘কারণ তুমি তোমার নিয়তির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছ। তবে তুমি এখন কাজটি প্রায় ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে গেছ।’

'আর এমন অবস্থা কখনো সৃষ্টি হওয়া মাত্রই আপনি সবসময় সেখানে চলে আসেন?'

'না, সবসময় এভাবে নয়। তবে আমি সবসময় উপস্থিত হই, কোনো না কোনো আকারে। অনেক সময় আমি সমাধান কিংবা ভালো আইডিয়া হিসেবে হাজির হই। আবার কখনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটা সহজ করে দিই। আরো অনেক কিছু করি। তবে বেশির ভাগ সময় লোকজন বুঝতেই পারে না, তাদের জন্য আমি কিছু করছি।'

বুড়ো লোকটি এক সপ্তাহ আগে ঘটা একটি ঘটনা বললেন। এক খনি খননকারীর সামনে একটি পাথরের আকারে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। পান্নার খনি খোঁজার নেশায় ওই লোক তার সবকিছু খুইয়ে ফেলেছিলেন। তিনি একটি নদীতে পাঁচ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছিলেন। একটি পান্না পাওয়ার জন্য লাখ লাখ পাথর পরীক্ষা করছিলেন। লোকটি আর মাত্র একটি পাথর পরীক্ষা বাকি থাকতে তার সব কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। মাত্র একটি পাথর! সেটি পরীক্ষা করে দেখলেই তিনি পেয়ে যেতেন তার কাঙ্ক্ষিত সেই পান্না। লোকটি যেহেতু তার নিয়তিতে পৌঁছার জন্য সবকিছু কোরবানি করেছিলেন, বুড়ো তাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজেকে পাথরে পরিণত করে গড়িয়ে খনিখননকারীর পায়ের কাছে পড়লেন। খনি খননকারী তার পাঁচ বছরের কাজে হতাশ হয়ে ক্রোধে পাথরটি কুড়িয়ে নিয়ে পাশে নিক্ষেপ করলেন। তিনি এত জোরে ওই পাথরের উপর এই পাথর ছুঁড়েছিলেন যে আঘাত লাগামাত্র সেটি ভেঙে গেল। আর ভাঙা পাথর থেকে বের হয়ে এলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পান্না।

'মানুষ তাদের জীবনের প্রথম দিকে জানতে পারে, তাদের সৃষ্টির কারণ কী,' বললেন বুড়ো একটু তিক্ততার সাথে। 'হয়তো এ কারণেই তারা এত তাড়াতাড়ি নির্ধারিত পথ ছেড়েও দেয়। এভাবেই সবকিছু চলতে থাকে।'

বুড়োকে ছেলেটা মনে করিয়ে দিলো, গুপ্তধন সম্পর্কে তিনি তাকে কিছু বলেছিলেন।

'প্রবাহিত পানির শক্তিতে গুপ্তধন বেরিয়ে আসে, আবার সেই একই স্রোতের কারণেই তা চাপা পড়ে যায়,' বললেন বুড়ো। 'তুমি যদি তোমার নিজের সম্পদ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে তোমাকে তোমার ভেড়ার পালের ১০ ভাগের এক ভাগ আমাকে দিতে হবে।'

'আমার সম্পদের ১০ ভাগের এক ভাগের কথা আসছে কেন?'

বুড়ো লোকটি হতাশ হলেন বলে মনে হলো। 'এখনো তোমার হাতেই আসেনি, এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করলে সেটি পাওয়ার জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।'

ছেলেটা তাকে বলল, সে ইতোমধ্যেই জিপসিকে তার সম্পদের ১০ ভাগের এক ভাগ দিয়ে দেওয়ার ওয়াদা করেছে।

'জিপসিরা এমনটি করতে ওস্তাদ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুড়ো লোকটি। 'আমি মনে করি, জীবনের প্রতিটি বিষয়েরই মূল্য আছে - তোমার তা শেখা উচিত। আলোর যোদ্ধারা এটিই শেখানোর চেষ্টা করেন।'

ছেলেটাকে বইটি ফেরত দিলেন বুড়ো লোকটি।

'আগামীকাল ঠিক এই সময় তোমার ভেড়ার পাল থেকে ১০ ভাগের এক ভাগ নিয়ে আসবে। আমি তোমাকে বলে দেবো, কিভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবে। শুভ সন্ধ্যা।'

এরপর তিনি বাজারের কোণের দিকে হাওয়া হয়ে গেলেন।

***

ছেলেটা আবার তার বই পড়তে শুরু করল। কিন্তু কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছিল না। সে শিহরিত ও বিধ্বস্ত। সে বুঝতে পারছিল, বুড়ো লোকটির কথাই ঠিক। সে ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়ে একটি রুটি কিনল। তারপর ভাবতে থাকল, বুড়োর কথাগুলো এ দোকানদারকে বলে দেবে কি-না। অনেক সময় কিছু চেপে যাওয়াই ভালো, সে চিন্তা করল। তারপর কিছুই বলল না। সে যদি কিছু বলে, তবে দোকানকার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বের হয়ে পড়বে কিনা তা নিয়ে তিন দিন ধরে ভাবতেই থাকবে। যদিও সে এখনকার জীবনের সবকিছুতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন সে কথাগুলো বললে দোকানদারের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হবে। অনেক অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল ছেলেটা। তারপর সে নগরীর রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল। একসময় নগরীর ফটকের কাছে নিজেকে দেখতে পেল সে। এখানে একটি ছোট ভবন আছে। এখানকার কাউন্টার থেকেই লোকজন আফ্রিকা যাওয়ার টিকেট কেনে। আর সে জানে, আফ্রিকায় আছে মিসর।

'আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' কাউন্টারের পেছন থেকে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল।

'সম্ভবত আগামীকাল,' ছেলেটা চলে যেতে যেতে বলল। একটি ভেড়া বিক্রি করেই খাড়ির ওপরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। আইডিয়াটি তাকে ভয় পাইয়ে দিলো।

'আরেক স্বপ্নবাজ,' ছেলেটাকে হেঁটে চলে যেতে দেখে টিকেট বিক্রেতা তার সহকারীকে বলল। 'সফর করার মতো টাকা তার কাছে নেই।'

টিকেটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটার মনে পড়েছিল তার ভেড়ার পালের কথা। সে সিদ্ধান্ত নিলো, রাখাল জীবনেই ফিরে যাবে। গত দুই বছরে রাখালগিরির সবকিছু শিখেছে : সে জানে ভেড়ার পশম ছাঁটতে, গর্ভবতী ভেড়ির যত্ন নিতে, নেকড়ের কবল থেকে ভেড়াকে রক্ষা করতে। সে আন্দালুসিয়ার সব মাঠ, প্রান্তর চেনে। সে তার পশুগুলোর প্রতিটির সত্যিকারের দাম জানে।

সে সিদ্ধান্ত নিলো, সোজা পথে নয়, সবচেয়ে দীর্ঘ পথ ধরে সে তার বন্ধুর আস্তাবলে ফিরবে। তাই সে নগর-দুর্গ ছাড়িয়ে গেল। তারপর আস্তাবলের দিকে না এগিয়ে পাথরের ঢালু পথটি বেয়ে প্রাচীরের শীর্ষে উঠল। সেখান থেকে সে দূরে আফ্রিকা দেখতে পেল। একবার কেউ একজন তাকে বলেছিল, ওই ওখান থেকেই মুরেরা এসেছিল স্পেন দখল করতে।

সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে প্রায় পুরো নগরী দেখা যায়। এমনকি যে বাজারে সে বুড়ো লোকটির সাথে কথা বলেছিল, সেই স্থানটিও দেখা যাচ্ছিল। বুড়ো লোকটির সাথে আমার দেখা হওয়া ছিল অলক্ষুণে ব্যাপার, তার মনে হলো। সে এই শহরে এসেছিল একটি মাত্র কারণে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারেন এমন এক নারীর দেখা করতে। সে যে রাখাল, এতে ওই নারী বা বুড়ো লোক কেউ মুগ্ধ হয়নি। তারা সবাই নিঃসঙ্গ মানুষ, তারা কোনো কিছুকে পাত্তা দেয় না। তাদের কেউ বোঝে না, রাখালেরা তাদের ভেড়ার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে থাকে। সে তার পালের প্রতিটি ভেড়া সম্পর্কে সবকিছু জানে : সে জানে কোনটি খোঁড়া, কোনটি আর দুই মাস পরে বাচ্চা দেবে, কোনটি সবচেয়ে অলস। সে তাদের পশম ছাঁটতে পারে, জবাই করতে জানে। সে ভেড়াগুলো ছেড়ে গেলে তারা কষ্টে পড়বে।

বাতাসের বেগ বাড়তে শুরু করল। এই বাতাস সে চেনে : লোকজন একে লেভেন্টার বলে। কারণ এই বাতাসে ভর করেই লেভেন্ট থেকে মুরেরা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্তে এসেছিল।

লেভেন্টার আরো তীব্র হতে লাগল। ছেলেটা ভাবতে লাগল, আমি এখন এখানে আমার ভেড়ার পাল আর আমার সম্পদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। যেসব জিনিসে সে অভ্যস্ত। সেগুলো, নাকি সে যেগুলো পেতে চায় সেগুলো - দুটির মধ্যে যেকোনো একটি ছেলেটাকে বেছে নিতেই হবে। দোকানির মেয়ের কথাও মনে পড়ল। তবে মেয়েটি তার কাছে ভেড়ার পালের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ মেয়েটি তার ওপর নির্ভরশীল নয়। সে হয়তো তাকে মনেও রাখেনি। সে নিশ্চিত, যেদিন মেয়েটির সামনে সে হাজির হয়েছিল, সেটি আলাদা কোনো দিন ছিল না : মেয়েটির কাছে প্রতিটি দিনই একই রকম, প্রতিটি দিনই পরের দিনের মতো। কারণ সূর্য উঠার ফলে প্রতিটি দিনেই প্রত্যেকের জীবনেই যে ভালো অনেক কিছু ঘটে, তা লোকজন বুঝতেই পারে না।

আমি আমার মা, বাবা আর নগর-দুর্গ পেছনে ফেলে এসেছি। তারা আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আমিও হয়ে পড়েছি। আমি না থাকলে ভেড়ার পালও অভ্যস্ত হয়ে যাবে, ছেলেটা ভাবল।

সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে বাজারটি দেখা যায়। লোকজন এখনো ফাস্ট ফুডের দোকানে আসছে, যাচ্ছে। সে যে বেঞ্চে বুড়ো লোকটির সাথে কথা বলেছিল, এখন সেখানে এক তরুণ দম্পতি বসে আছে, তারা চুমু খাচ্ছে।

'ওই দোকানদার...' তার মুখ ফুটে শব্দ বের হলো। তবে কথাটি সে কোনো কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছিল। ভূমধ্যসাগর থেকে আসা বাতাসের ঝাপটা আরো বাড়ছিল। বাতাসের বেগ ছেলেটা তার মুখে অনুভব করছিল। ওই বাতাস মুরদের নিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ। এই বাতাস মরুভূমি আর নেকাব পরা নারীদের গন্ধও বয়ে আনে। এই বাতাস সাথে করে ওইসব মানুষের ঘাম আর স্বপ্ন বয়ে আনে, যারা অজানার খোঁজে বের হয়, যারা স্বর্ণ আর অভিযানের নেশায় ঘর ছাড়ে - এবং যারা পিরামিডের জন্য ছুটে যায়। বাতাসের স্বাধীনতার জন্য ছেলেটার হিংসা হলো। বুঝতে পারল, একই স্বাধীনতা সে নিজেও পেতে পারে। সে নিজে ছাড়া আর কেউ তাকে পেছনে টেনে ধরে রাখতে পারে না। ভেড়ার পাল, দোকানির মেয়ে আর আন্দালুসিয়ার মাঠগুলো কেবল তার নিয়তির পথে ছড়ানো কয়েকটা ধাপ।

পর দিন দুপুরে বুড়ো লোকটির সাথে দেখা করল ছেলেটা। সে তার জন্য ছয়টি ভেড়া নিয়ে এসেছে।

'আমি অবাক হয়ে গেছি,' ছেলেটা বলল। 'আমার বন্ধু সাথে সাথে অন্য সব ভেড়া কিনে নিয়েছে। সে বলেছে, সে সবসময় রাখাল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। ভালো লক্ষণ এটি।

'এভাবেই সবসময় সবকিছু হয়,' বুড়ো লোকটি বললেন। 'একে বলা হয়, শুভ কাজের তত্ত্ব। তুমি যদি প্রথমবার কার্ড খেলো, তখন তোমার জয়ের প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকবে। কারণ নতুনের ভাগ্য তোমার সাথেই থাকে।'

'এমন হয় কেন?'

'কারণ, এমন একটি শক্তি আছে, যে চায় তুমি তোমার নিয়তিকে বাস্তবায়ন করতে পারো; একটি সফলতার স্বাদ দিয়ে তোমার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দেয় ওই শক্তি।'

বুড়ো লোকটি ভেড়াগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন, তিনি দেখতে পেলেন, একটি খোঁড়া। ছেলেটা বলল, খোঁড়া হওয়ায় এর দাম কমে যায়নি। কারণ এই ভেড়া তার দলের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, এটিই সবচেয়ে বেশি পশম দেয়।

'গুপ্তধন কোথায়?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'মিসরে, পিরামিডের কাছে।'

ছেলেটা বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। বৃদ্ধা তাকে একই কথা বলেছেন। কিন্তু এ জন্য কোনো ফি নেননি।

'গুপ্তধন পেতে হলে তোমাকে শুভ-অশুভের ইঙ্গিত অনুসরণ করতে হবে। ঈশ্বর একেবারে প্রত্যেকের জন্য একটি করে পথ তৈরি করে রেখেছেন। তোমাকে কেবল তোমার জন্য তৈরি পথে চলার জন্য শুভ-অশুভের নিদর্শন অনুসরণ করতে হবে।'

ছেলেটা কিছু বলার চেষ্টা করেছিল। তার আগেই একটি প্রজাপতি এসে তার ও বুড়োর মাঝখানে এসে উড়াউড়ি করতে লাগল। তার দাদার কথা মনে পড়ে

গেল। তিনি একবার বলেছিলেন যে ঝিঁ ঝি পোকা, কল্পনা, সরীসৃপ, চার-পাতার লবঙ্গের মতো প্রজাপতিও শুভ লক্ষণ।

'একেবারেই ঠিক,' বুড়ো লোকটি বললেন। তিনি ছেলেটার মনে থাকা ভাবনা পড়তে পেরেছেন। 'ঠিক যেমন তোমার দাদা তোমাকে শিখিয়েছেন। এসব হলো শুভ লক্ষণ।'

বুড়ো তার জামা খুলে ফেললেন। উজ্জ্বল সোনার তৈরি, রত্নপাথর বসানো একটি বর্ম দেখা গেল তার বুকে। মনে পড়ল, আগের দিন এটিই চমক দিয়েছিল!

তিনি আসলেই রাজা! চোর-ছ্যাচ্চরদের এড়ানোর জন্য তিনি নিশ্চয় ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন।

'এগুলো নাও,' বুড়ো বললেন। তার হাতে তখন একটি সাদা আর একটি কালো পাথর। পাথর দুটি ছিল তার বর্মের একেবারে মাঝখানে। "এ দুটিকে বলে উরিম আর থুমিম। কালোটির মানে 'হ্যাঁ', সাদাটির মানে 'না'। যখন কোনো শুভ-অশুভ লক্ষণ বুঝতে পারবে না, তখন পাথর দুটি তোমাকে সাহায্য করবে। সবসময় সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানতে প্রশ্ন করবে।"

'তবে চেষ্টা করবে, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে। গুপ্তধন যে পিরামিডে আছে, তা তুমি আগে থেকেই জানো। কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে ছয়টি ভেড়া নিয়েছি এ কারণে, যাতে তুমি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারো।'

ছেলেটা পাথর দুটি তার ঝোলায় রাখল। এর পর থেকে সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে থাকবে।

'কখনো ভুলবে না, তুমি যা কিছুই করো না কেন, কিছুই কিন্তু আলাদা কিছু নয়, সবই আসলে একই জিনিস। তাদের বাইরের রূপটি কেবল ভিন্ন। আর কখনোই শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের ভাষা ভুলবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছার আগে কখনো তোমার নির্ধারিত পথ ভুলে যাবে না।'

'আর যাওয়ার আগে আমি তোমাকে ছোট্ট একটি গল্প বলছি, শোনো।

'এক দোকানদার তার ছেলেকে পাঠিয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে সুখের গোপন রহস্য সম্পর্কে জানতে। বালকটি ৪০ দিন ধরে মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এক পর্বতের উপরে সুন্দর একটি প্রাসাদের সামনে এলো। এখানেই সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটি বাস করতেন।

'বালকটি প্রাসাদের প্রধান কক্ষে প্রবেশ করল। সে আশা করেছিল, এখনে সে দরবেশ-ধরনের কাউকে দেখতে পাবে। না, সে তেমন কাউকে দেখতে পেল না। বরং সেখানে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। সওদাগরেরা আসা-যাওয়া করছে, কোণায় কোণায় লোকজন কথাবার্তায় মশগুল, মৃদু ছন্দে ছোট অর্কেস্ট্রা চলছে, একটি টেবিলে পৃথিবীর ওই অংশে পাওয়া সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার থরে থরে সাজানো। জ্ঞানী ব্যক্তিটি সবার সাথে কথা বলছেন। বালকটিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে তার পালা আসার জন্য দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো।

'জ্ঞানী লোকটি মনোযোগ দিয়ে বালকটির আসার কারণ শুনলেন। তবে সুখের রহস্য সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো সময় তখনই দিতে পারলেন না। তিনি বালকটিকে প্রাসাদটি ঘুরে দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে বললেন।

'তবে এর মধ্যে আমি তোমাকে একটি কাজ করতে বলব,' বললেন জ্ঞানী ব্যক্তিটি। তিনি বালকটিকে দুই ফোঁটা তেল ভরা একটি টেবিল চামচ দিলেন। 'তুমি ঘুরে বেড়ানোর সময় একটু তেলও যাতে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রেখে চামচটি ধরে রাখবে।'

'বালকটি প্রাসাদের অসংখ্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, নিচে নামল, চামচের দিকে কড়া নজর রেখেই। দুই ঘণ্টা পর সে ওই জ্ঞানী ব্যক্তির বসার ঘরে ফিরে এলো।

"'আচ্ছা,' জ্ঞানী ব্যক্তিটি জানতে চাইলেন, 'তুমি কি আমার ডাইনিং হলে ঝুলন্ত চমৎকার ঝাড়বাতিগুলো দেখেছ? ১০ বছর সময় নিয়ে গড়া চোখ জুড়ানো বাগানটি লক্ষ করেছ? আমার লাইব্রেরির সুন্দরভাবে বাঁধাই করা বইগুলোর দিকে কি তাকিয়েছিলে?

"বালকটি লজ্জিত হলো, স্বীকার করল, সে কিছুই দেখেনি।

তার একমাত্র চিন্তা ছিল জ্ঞানী ব্যক্তিটির দেওয়া চামচ-ভরা তেল যাতে একটুও না পড়ে।

"'তাহলে আবার যাও, আমার দুনিয়ার আশ্চর্য জিনিসগুলো ঘুরে-ফিরে দেখ,' জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন। 'তুমি যদি কোনো লোকের বাড়ি না চেনো, তবে তাকে বিশ্বাস করতে পারো না।'

"স্বস্তি পেয়ে বালকটি চামচটি তুলে নিলো, প্রাসাদটি দেখতে বের হলো। এবার সে ছাদ, দেয়াল- সবকিছু দেখল। সে বাগান দেখল, আশপাশের পর্বতগুলো দেখল, সুন্দর সুন্দর ফুল দেখল, পছন্দ হওয়া সবকিছুর স্বাদ নিলো। জ্ঞানী ব্যক্তিটির কাছে ফিরে গিয়ে সে যা যা দেখেছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলো।

"'কিন্তু আমি তোমাকে যে তেলের ফোঁটা দিয়েছিলাম, তা কোথায়?' জ্ঞানী ব্যক্তিটি জানতে চাইলেন।

"হাতে ধরা চামচের দিকে তাকিয়ে বালকটি দেখল, একটু তেলও নেই।

"'ঠিক আছে, আমি তোমাকে কেবল একটি পরামর্শই দিতে পারি,' জ্ঞানীদের মধ্যে পরম জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন। 'সুখের গোপন কথা হলো, তুমি দুনিয়ার সব আশ্চর্য জিনিস দেখবে, কিন্তু কখনোই চামচের তেলের ফোঁটার কথা ভুলবে না।'"

রাখাল ছেলেটা কিছুই বলল না। বুড়ো রাজা তাকে যে গল্পটা বলেছেন, সে এর মর্মকথা বুঝতে পেরেছে। একজন রাখাল হয়তো ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে, কিন্তু সে কখনো তার ভেড়ার কথা ভোলে না।

বুড়ো লোকটি এবার ছেলেটার দিকে তাকালেন। তিনি তার হাত দুটি একসাথে করলেন, ছেলেটার মাথার ওপর বেশ কিছু অদ্ভুত ইঙ্গিত করলেন। তারপর তার ভেড়াগুলো নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন।

***

তারিফার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় আছে একটি পুরনো দুর্গ। মুরেরা তৈরি করেছিল এটি। এর প্রাচীরের উপর থেকে আফ্রিকা দেখা যায়। সালেমের রাজা মেলচিজেদেক ওই দিন বিকেলে দুর্গ-প্রাচীরের উপর বসেছিলেন, ভূমধ্যসাগরের বাতাস তার মুখে আছড়ে পড়ছিল। ভেড়াগুলো আশপাশে অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করছিল। তারা তাদের নতুন মালিকের সাথে সহজ হতে পারছিল না, এত বেশি পরিবর্তনে তারা অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারা সবাই খাবার আর পানি চাচ্ছিল।

মেলচিজেদেক দেখলেন, একটি ছোট জাহাজ বন্দর ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি আর কখনো ছেলেটাকে দেখতে পাবেন না, ঠিক যেমন তিনি আর কখনো আব্রাহামকে দেখেনি, তার কাছ থেকে এক-দশমাংশ ফি নেওয়ার পর। এই তার কাজ।

দেবতাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। কারণ তাদের কোনো নিয়তি নেই। কিন্তু তবুও সালেমের রাজা মনে-প্রাণে চাইছিলেন, ছেলেটা যেন সফল হয়।

বিষয়টি খুবই খারাপ যে ছেলেটা খুব তাড়াতাড়ি আমার নাম ভুলে যাবে, তিনি ভাবলেন। আমার উচিত ছিল, বারবার নামটি তাকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর আমার সম্পর্কে যখনই কথা ওঠত, সে কথা বলত, আমি ছিলাম সালেমের রাজা মেলচিজেদেক।

তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। একটু লজ্জিত হলেন। তারপর বললেন, 'আমি জানি, এটিই হলো অসংখ্য অসার দম্ভের সবচেয়ে বড় দম্ভ, ঠিক যেভাবে তুমি বলেছ, আমার প্রভু। কিন্তু একজন বুড়ো রাজা মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে সামান্য গর্ব করতেই পারে।'

***

আফ্রিকা কেমন খাপছাড়া, ছেলেটা ভাবল।

তানজিয়ারের একটি বারে বসেছিল সে। তানজিয়ারের সরু রাস্তাগুলোর দুই পাশে আরো যেসব বার দেখেছে সে, এটি সেগুলোর মতোই। কেউ কেউ বিশাল পাইপে ধূমপান করছে, টান দিয়ে একজন অন্যকে পাইপটি দিচ্ছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে দলে দলে হেঁটে বেড়ানো পুরুষ মানুষ দেখেছে। দেখেছে মুখ ঢাকা নারীদের। মিনারে উঠে মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার পর সবার হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে কপাল ঠেকানোটাও তার চোখে পড়েছে। অনেক কিছুই সে দেখে ফেলেছে।

'বিধর্মীদের ধর্মকর্ম,' সে মনে মনে বলল। শৈশবে চার্চে সে সবসময় সেইন্ট স্যান্টিয়াগো মাতামুরুসকে তার সাদা ঘোড়ার মূর্তিতে দেখেছে। সেইন্টের হাতে খাপ-খোলা তরবারি। আর এ ধরনের পা-ভাঁজ করা লোকজন তার সামনে নত হয়ে

থাকতে দেখা যেত তাতে। ছেলেটা অস্বস্তি অনুভব করল, নিজেকে ভয়ঙ্কর রকমের নিঃসঙ্গ মনে হলো। তাদের সম্পর্কে বিধর্মীদের খারাপ মনোভাব রয়েছে।

এছাড়াও, সফরের তাড়াহুড়ায় একটি বিষয় তার মনে ছিল না। মাত্র একটি বিষয়। আর এটিই তাকে তার গুপ্তধন সন্ধানের কাজ অনেক দিন পিছিয়ে দিতে পারে। সেটি হলো এই দেশে কেবল আরবি ভাষাই চলে।

বারের মালিক তার দিকে এগিয়ে এলেন। ছেলেটা পাশের টেবিলে যে পানীয় পরিবেশন করা হচ্ছিল, তেমন কিছু দিতে অর্ডার দিলো। এলো তেতো চা। ছেলেটার মনে হলো, সে মদের কথা বললে পারত।

তবে তা নিয়ে তার ঠিক এখনই চিন্তা করার সুযোগ নেই। তার এখনকার একমাত্র চিন্তা গুপ্তধন এবং তা পাওয়ার পথ খুঁজে বের করা। ভেড়ার পাল বিক্রি করার ফলে তার ঝোলায় বেশ ভালো টাকাই জমা হয়েছে। ছেলেটা জানে, টাকার মধ্যে জাদু আছে। আর যার হাতেই টাকা আছে, সে কখনো একা থাকে না। বেশি দেরি হবে না, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সে হয়তো পিরামিডে যেতে পারবে। স্বর্ণের বর্ম পরা ওই বুড়ো মাত্র ছয়টি ভেড়ার জন্য নিশ্চয় মিথ্যা বলেননি।

বুড়ো লোকটি কেবল নিদর্শন আর শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের কথা বলেছেন। ছেলেটা খাড়ি পার হওয়ার সময় শুভ-অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে অনেক ভেবেছে। হ্যাঁ, বুড়ো লোকটি জানতেন, সে কী নিয়ে কথা বলছে : আন্দালুসিয়ার মাঠে মাঠে ছেলেটার থাকার সময়, সে শিখেছিল আকাশ আর মাটি দেখেই কোন পথটি বেছে নিতে হবে। সে জেনেছিল, বিশেষ কোনো পাখির উপস্থিতি মানে কাছাকাছি সাপ আছে, নির্দিষ্ট ধরনের ঝোপ থাকা মানে ওই এলাকায় পানি রয়েছে। ভেড়ারা তাকে এগুলো শিখিয়েছে।

ঈশ্বর যদি ভেড়াদের এমন চমৎকারভাবে চালিত করেন, তিনি তবে মানুষকেও চালাবেন, সে ভাবল। এই ভাবনাই তার মধ্যে ভালো লাগার অনুভূতি এনে দিলো। এখন চা কম তেতো লাগছে।

'তুমি কে?' স্প্যানিশ ভাষায় প্রশ্ন শুনতে পেল সে।

ছেলেটা স্বস্তি পেল। তার শুভ-অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে ভাবনার মধ্যেই কেউ একজন এসে পড়েছে।

'তুমি কিভাবে স্প্যানিশ শিখলে?' সে জানতে চাইল। নবাগত লোকটি পাশ্চাত্যের পোশাক পরা, তবে তার গায়ের রঙ দেখে মনে হচ্ছে সে এই নগরীরই লোক। তার বয়স আর উচ্চতা ছেলেটার কাছাকাছি।

'এখানকার প্রায় সবাই স্প্যানিশে কথা বলে। এখান থেকে স্পেন যেতে লাগে মাত্র দুই ঘণ্টা।'

'বসো, কিছু আপ্যায়ন করতে দাও,' ছেলেটা বলল। 'আর আমাকে এক গ্লাস মদ দিতে বলো। এই চা বাজে লাগছে।'

'এই দেশে মদ নেই,' তরুণ ছেলেটা বলল। 'এখানকার ধর্মে মদ নিষিদ্ধ।'

ছেলেটা তখন তাকে বলল, তার পিরামিডে যাওয়া দরকার। গুপ্তধনের কথা তার মুখ ফসকে বের হতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিলো, বলবে না। বলে ফেললে এ আরব লোকটি হয়তো সেখানে নিয়ে যাওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে গুপ্তধনের একটি অংশ দাবি করবে। তার মনে পড়ল বুড়ো লোকটির কথা। তিনি হাতে না আসা কিছু কাউকে দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

'তুমি যদি পারো, তবে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো। আমার গাইড হিসেবে কাজ করলে তোমাকে টাকা দেবো।'

'সেখানে কিভাবে যেতে হয়, সে ব্যাপারে তোমার কি কোনো ধারণা আছে?' নবাগত জানতে চাইল।

ছেলেটা লক্ষ করল, বারের মালিক কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছে। এই লোকের উপস্থিতি তার ভালো লাগছিল না। তবে গাইডকে তার ভালো লেগেছে, সে এ সুযোগটি হাতছাড়া করতে চায় না।

'তোমাকে পুরো সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে,' তরুণটি বলল। 'আর সেজন্য তোমার কাছে অনেক টাকা থাকতে হবে। আমি জানতে চাইছি, তোমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে কি-না।'

ছেলেটার কাছে এটি অদ্ভুত প্রশ্ন মনে হলো। তবে সে বুড়ো লোকটির কথায় বিশ্বাস করেছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন, তুমি মনে-প্রাণে কিছু চাইলে মহাবিশ্বের সবকিছু একযোগে তোমাকে সাহায্য করবে।

ছেলেটা তার ঝোলা থেকে তার সব টাকা বের করল, তরুণটিকে সেগুলো দেখাল। বারের মালিক কাছে এসে সব দেখলেন। বারের মালিক আর এই তরুণ আরবিতে কিছু কথাবার্তা বলল। বারের মালিককে উত্তেজিত মনে হলো।

'চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই,' নবাগত বলল। 'তিনি চান, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি।'

এই প্রস্তাব ছেলেটার ভালো লাগল। সে বিল মেটানোর জন্য দাঁড়াল। তবে মালিক তাকে ধরে রাগী গলায় অনেক কথা শোনাতে লাগল। ছেলেটাও ছিল শক্তিশালী। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা জাগল। তবে ভাবল, সে এখন বিদেশ-বিভুঁয়ে আছে। তার নতুন বন্ধু ধাক্কা দিয়ে মালিককে সরিয়ে টেনে ছেলেটাকে সাথে নিয়ে বাইরে চলে এলো। 'ও তোমার টাকা চেয়েছিল,' সে বলল। 'তানজিয়ার বাকি আফ্রিকার মতো নয়। এটি একটি বন্দর, আর প্রতিটি বন্দরেই আছে চোর-বাটপার।'

নতুন বন্ধুকে বিশ্বাস করল ছেলেটা। সে তাকে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে। সে তার টাকা বের করে গুণল।

'আমরা কালই পিরামিডের উদ্দেশে রওনা হবো,' তরুণ একথা বলে সব টাকা নিজের কাছে নিয়ে নিলো। 'তবে তার আগে আমাদের দুটি উট কিনতে হবে।'

তারা একসাথে তানজিয়ারের সরু রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটতে লাগল। সবখানে দোকানপাট, নানা সামগ্রীতে ভরা। তারা একটি বিশাল প্লাজার মাঝখানে পৌঁছাল, সেখানেই রয়েছে বাজারটি। হাজার হাজার লোক সেখানে। কেউ দরদাম করছে, কেউ বিক্রি করছে, কেউ কিনছে। ছোরা-চাকুর মধ্যেই সাজানো সবজি, সিগারেটের পাশেই কার্পেট রাখা রয়েছে। তবে একটি মুহূর্তের জন্যও তরুণটিকে চোখের আড়াল করতে চাইছিল না সে। কারণ তার কাছেই যে সব টাকা। সে টাকাগুলো তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলবে বলে ভাবল। কিন্তু মনে হলো, কাজটি বন্ধুসুলভ হবে না। সে এই দেশের আদব-কায়দার কিছুই জানে না।

'আমি কেবল তাকে লক্ষ করে যাব,' সে নিজে নিজে বলল। সে জানত, তার বন্ধুর চেয়ে সে নিজে শক্তিশালী।

হঠাৎ করে ওই গোলকধাঁধার মধ্যেই সে একটি তরবারি দেখল। তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর তরবারি। কী চমৎকার! রূপার বাঁট লাগানো, দামি কিছু পাথরও গেঁথে দেওয়া আছে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মিসর থেকে ফেরার পথে তরবারিটি কিনবে।

'স্টলের মালিককে জিজ্ঞাসা করো তো, তরবারিটির দাম কত,' সে তার বন্ধুকে বলল। তখনই বুঝতে পারল, তরবারিটি দেখতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ড সে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। তার হৃদপিণ্ডটি ধরে কে যেন টান দিলো। বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠল। মনে হলো, হঠাৎ করে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। আশপাশে তাকাতেও তার ভয় করতে লাগল। কারণ সে জানত, সে কী দেখবে। সে আরেকবার সুন্দর তরবারিটি দেখে নিলো। তারপর সাহসে ভর করে আশপাশে তাকাল।

পুরো বাজারে সে চোখ ফেলল। লোকজন আসছে, যাচ্ছে, চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, কেনাকাটা করছে, নাম না-জানা সব খাবারের ঘ্রাণ ভাসছে।... না, কোথাও দেখা মিলল না তার নতুন সঙ্গীর।

ছেলেটা বিশ্বাস করতে চাইল, তার বন্ধু স্রেফ দুর্ঘটনাক্রমে আলাদা হয়ে গেছে। তার না আসা পর্যন্ত সে সেখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো। তার সেখানে অপেক্ষা করার সময়ই এক মোয়াজ্জিন কাছের মিনারে উঠে আজান দিতে শুরু করল। বাজারের সবাই নামাজ পড়ল, দোয়া-কালাম পড়ল। তারপর কর্মী পিঁপড়ার দলের মতো তারা তাদের দোকানপাট গুটিয়ে চলে গেল।

সূর্যও বিদায় নেওয়ার আয়োজন করতে লাগল। ছেলেটা সূর্যের অস্ত যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। একসময় প্লাজার চারপাশ ঘিরে থাকা সাদা বাড়িগুলোর পেছনে লুকিয়ে গেল সূর্যটি। তার মনে পড়ল, ওই সকালেই সূর্য উঠার সময় সে ছিল অন্য একটি মহাদেশে, তখনো সে ৬০টি ভেড়ার মালিক ছিল, একটি মেয়ের সাথে দেখা করার প্রহর গুণছিল। ওই সকালে সবকিছুই তার জানা ছিল, পরিচিত মাঠগুলো দিয়ে পথ চলার সময় কী ঘটতে যাচ্ছে, সে জানত। কিন্তু এখন সূর্যটি ডুবে যাওয়ার সময় সে ভিন্ন একটি দেশে, অজানা ভূমিতে অচেনা লোক। সে

তাদের ভাষায় পর্যন্ত কথা বলতে পারে না। সে এখন আর রাখাল নয়। আসলে সে এখন কিছুই নয়। এমনকি ফিরে যাওয়া এবং গিয়ে নতুন কিছু শুরু করার মতো টাকাও নেই তার কাছে।

এর সবকিছুই ঘটে গেল সূর্যটির উদয় আর অস্ত যাওয়ার মাঝখানের সময়টিতে, ছেলেটা ভাবল। নিজের জন্য তার দুঃখ হলো। এত নাটকীয়ভাবে ও ভয়াবহভাবে নিজের জীবনটি বদলে যাওয়ার জন্য সে অনুতাপ করছিল।

এত বেশি অপদস্থ হয়েছিল যে তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। তবে সে কখনো এমনকি তার ভেড়াগুলোর সামনেও কাঁদেনি। অবশ্য এখন বাজারটি ফাঁকা। বাড়ি থেকে সে অনেক দূরে। তাই সে কাঁদল। সে কাঁদল, কারণ ঈশ্বর ন্যায়বিচারহীন, কারণ যারা তাদের স্বপ্নে বিশ্বাস করেছে, তাদেরকে ঈশ্বর এভাবেই প্রতিদান দিলেন।

আমার যখন ভেড়ার পাল ছিল, তখন আমি ছিলাম সুখী, আর আমার আশপাশে যারা থাকত, তাদেরকে সুখী করতাম। লোকজন আমার আগমনকে স্বাগত জানাত, সে ভাবল। কিন্তু এখন আমি ব্যথিত, একাকী। আমি লোকজনের প্রতি তিক্ত ও অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ছি, কারণ এক লোক আমার সাথে প্রতারণা করেছে। যারা তাদের গুপ্তধন পেয়েছে, আমি তাদের ঘৃণা করি, কারণ আমি আমার অংশ একেবারেই পাইনি। আমার কাছে সামান্য যা আছে, তা আর নষ্ট করব না। এ দিয়ে তো আর বিশ্বজয় করা যাবে না।

সে তার ঝোলাটা খুলে দেখল, তার সম্পদের মধ্যে সেখানে কিছু অবশিষ্ট আছে কি-না। হয়তো জাহাজে খাওয়া স্যান্ডউইচটির কিছু অংশ এখনো আছে। কিন্তু সে যা পেল, তা হলো ওই ভারী বইটি, তার জ্যাকেট, আর বুড়োর দেওয়া দুটি পাথর।

পাথর দুটির দিকে তাকিয়ে সে কিছুটা সান্ত্বনা অনুভব করল। সোনার বর্ম পরা লোকটিকে ছয়টি ভেড়া দিয়ে এই মূল্যবান পাথর দুটি সে পেয়েছে। এখন সে এ দুটি পাথর বিক্রি করে ফিরে যাওয়ার টিকেট কিনতে পারে। তবে এবার সে আগের চেয়ে চালাক হবে, ছেলেটা ভাবল। ঝোলা থেকে বের করে পাথর দুটি সে তার পকেটে রাখল। এটি বন্দরনগরী। তার বন্ধু একমাত্র যে সত্য কথাটি বলেছিল, তা হলো, বন্দরনগরীগুলো চোর-বাটপারে ভর্তি।

এখন সে বুঝতে পারল, কেন বারের মালিক এত রেগে গিয়েছিল : ওই লোক আসলে তাকে তরুণটিকে বিশ্বাস করতে বারণ করেছিল। 'আমি অন্য কারো মতো নই- আমি যেমন দেখতে চাই, দুনিয়াকে সেই দৃষ্টিতেই দেখি, আসলে যা ঘটছে, সেভাবে নয়।'

সে ধীরে ধীরে পাথর দুটির ওপর আঙুল বুলাল, তাদের উষ্ণতার পরশ পেল, তাদের মসৃণতা বোঝার চেষ্টা করল। এখন তার সম্পদ বলতে এগুলোই। এগুলো হাতিয়ে হাতিয়ে দেখতে তার ভালোই লাগছে। এগুলো বুড়োর কথা তাকে মনে করিয়ে দিলো।

'তুমি যখন মনে-প্রাণে কিছু করতে চাইবে, তখন পুরো মহাবিশ্ব একযোগে তোমার পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসবে,' বলেছিলেন বুড়ো।

বুড়ো কোন সত্যটি বলেছিলেন ছেলেটা তা বোঝার চেষ্টা করল। এখন সে একটি ফাঁকা বাজারে। কানাকড়িও নেই তার কাছে। আবার এই রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য কোনো ভেড়া নেই। তবে পাথর দুটিই প্রমাণ দিচ্ছে, এক রাজার সাথে তার দেখা হয়েছিল। ওই রাজা জানেন ছেলেটার অতীত।

'এই পাথর দুটিকে বলে উরিম আর থুমিম, এগুলো তোমাকে শুভ-অশুভ ইঙ্গিত পড়তে সাহায্য করবে।' ছেলেটা পাথর দুটি আবার তার ঝোলায় ঢোকাল, সিদ্ধান্ত নিলো পরীক্ষা করবে। বুড়ো একেবারে সুস্পষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন। এখন ছেলেটাকে জানতে হবে, সে কী চায়? আর তা-ই সে জানতে চাইল, বুড়োর আশীর্বাদ এখনো তার সাথে আছে কি-না।

সে পাথর দুটির একটি বের করল। জবাব ছিল 'হ্যাঁ।'

'আমি কি আমার সম্পদ খোঁজার কাজে যাচ্ছি?' সে জানতে চাইল। সে আবার ঝোলার মধ্যে তার হাত ঢোকাল, একটি পাথর তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল। কাজটি করার সময় ঝোলার পাথর দুটিতে ধাক্কা লাগল। ফলে ঝোলার একটি ছিদ্র দিয়ে দুটিই মাটিতে পড়ে গেল। ঝোলার মধ্যে যে ছিদ্র আছে, ছেলেটা আগে কখনো খেয়াল করেনি। সে বসে উরিম আর থুমিম কুড়িয়ে নিলো। তারপর আবার ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। তবে মাটিতে পাথর দুটি পড়ে থাকতে দেখে তার মাথায় আরেকটি চিন্তা ভেসে এলো।

'শুভ-অশুভ ইঙ্গিত চিনতে শেখো, এবং সেগুলো অনুসরণ করো,' বুড়ো রাজা তাকে বলেছিলেন।

একটি শুভ-অশুভ ইঙ্গিত। ছেলেটা ফিক হেসে ফেলল। সে পাথর দুটি আবার হাতে নিলো, আবার তার ঝোলায় ঢোকাল। ছিদ্রটি মেরামতের চিন্তা বাদ দিলো, পাথর দুটি আরো অনেক আগে যেকোনো সময় পড়ে যেতে পারত। সে শিখেছিল, কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো জানতে চাওয়া ঠিক নয়, কারণ কেউ তার নিজের নিয়তি থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। 'আমি ওয়াদা করেছিলাম, আমি সিদ্ধান্ত নেব নিজে,' সে নিজেকে বলল।

অবশ্য পাথর দুটি তাকে বলেছে, বুড়ো এখনো তার সাথে আছেন। আর এটিই তার মধ্যে আরো আত্মবিশ্বাস এনে দিলো। আবার সে ফাঁকা প্লাজাটি দেখে নিলো। এবার আগের চেয়ে কম খারাপ লাগল। এটি অদ্ভুত কোনো স্থান নয়; তবে নতুন জায়গা।

সবচেয়ে বড় কথা, সে সবসময় ঠিক এমনটাই চেয়েছে : নতুন নতুন জায়গা চেনা। এমনকি সে কখনো পিরামিডে না গেলেও ইতোমধ্যেই যেকোনো রাখাল যতটুকু চেনে, তার চেয়ে বেশি পথ সে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। ওহ, তারা কী জানে, মাত্র দুই ঘণ্টা জাহাজে চড়ার দূরত্বে কত ভিন্ন জিনিসই না রয়েছে, সে ভাবল। তার নতুন দুনিয়া এই মুহূর্তে স্রেফ একটি ফাঁকা বাজার। কিন্তু এর যখন পরিপূর্ণ

প্রাণবন্ত অবস্থায় ছিল, তখন জায়গাটিকে সে দেখেছে। এটি সে কখনো ভুলবে না। তরবারিটির কথা তার মনে পড়ল। ওই মনে পড়ায় তার কষ্ট হলো। তবে সত্য কথা হলো, এত সুন্দর তরবারি আগে সে কখনোই দেখেনি। এসব জিনিসের কথা ভাবতে ভাবতে সে বুঝতে পারল, তাকে একটি বেছে নিতে হবে : সে কি নিজেকে চুরির শিকার হওয়া নিঃস্ব লোক ভাববে, না-কি তার সম্পদের সন্ধানে বের হওয়া অভিযাত্রী মনে করবে?

'আমি অভিযাত্রী, আমি গুপ্তধনের সন্ধানে বের হয়েছি,' সে নিজেকে বলল।

***

কারো ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে গেল। বাজারের মাঝখানেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাজারের জীবন আবার ফিরে আসছে। চার দিকে তাকাল সে, ভেড়ার পাল দেখবে বলে আশা করেছিল। তারপরই তার মনে হলো, সে এখন নতুন দুনিয়ায়। তবে দুঃখ পাওয়ার বদলে সে খুশি হলো। তাকে এখন ভেড়ার খাবার আর পানি খুঁজে বেড়াতে হবে না। সে বরং এখন তার সম্পদের খোঁজে যেতে পারবে। তার পকেটে এখন একটি পয়সাও নেই। তবে তার মধ্যে আছে বিশ্বাস। সে আগের রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বই-পুস্তকে পড়া দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীর মতো হবে সে।

সে ধীরে ধীরে বাজার দিয়ে হেঁটে চলল। দোকানদাররা তাদের দোকান সাজাচ্ছে। এক মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে তার কাজে সহায়তা করল ছেলেটা। মিষ্টান্ন বিক্রেতার মুখে হাসি : তিনি সুখী, নিজের জীবনের ব্যাপারে সচেতন। এখন তিনি দিনের নির্ধারিত কাজ করতে প্রস্তুত। মিষ্টান্ন বিক্রেতার হাসি তাকে বুড়ো লোকটার- সেই রহস্যময় বুড়ো রাজার কথা মনে করিয়ে দিলো। 'এই মিষ্টান্ন বিক্রেতা নিশ্চয় কোনো দোকানদারের মেয়েকে বিয়ে করতে কিংবা পরে কোনো সময় ভ্রমণ করার জন্য এই কাজ করছেন না। তিনি এ কাজ করছেন, কারণ তিনি এটিই করতে চান,' ভাবল ছেলেটা। সে বুঝতে পারল, বুড়ো যা করেছেন, সে-ও তা করতে পারবে। কোনো লোক তার নিয়তির কাছে নাকি দূরে, তা অনুভব করা যায়। মিষ্টি তৈরির কাজটি সহজ, যদিও আমি আগে কখনো করিনি, ছেলেটার মনে হলো।

তারপর দোকান সাজানো হলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতা ওই দিন বানানো প্রথম মিষ্টিটি ছেলেটাকে দিলেন। সে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মিষ্টিটি খেল। তারপর সামনের দিকে পা বাড়াল। অল্প কিছু দূর যাওয়ার পরই বুঝতে পারল, মিষ্টির দোকান সাজানোর সময় তাদের একজন কথা বলেছে আরবিতে, অপরজন স্প্যানিশে।

কিন্তু তার পরও তারা একেবারে ঠিকঠাকভাবে একে অপরের কথা বুঝতে পেরেছে।

অবশ্যই এমন একটি ভাষা আছে, যা শব্দের ওপর নির্ভর করে না, ছেলেটা ভাবল। আমার ভেড়ার পালের সাথে আমার আগেই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, এখন লোকজনের সাথেও এমন ঘটেছে।

সে অনেক নতুন জিনিস শিখছিল। এসবের কিছু অভিজ্ঞতা তার আগেই ছিল, সেগুলো আসলে নতুন কিছু নয়। তবে আগে সে বুঝতেই পারেনি। সত্যি বলতে কী, সে এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে বুঝতে পারেনি। এখন তার বিশ্বাস হলো : আমি কোনো কথা বলা ছাড়াই যদি এই ভাষা বুঝতে পারি, তবে আমি দুনিয়াও বুঝতে পারব।

স্বস্তি ও ধীর-স্থিরভাবে সে সিদ্ধান্ত নিলো, সে এখন তানজিয়ারের সরু রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটবে। আর এ করেই সে শুভ-অশুভ ইঙ্গিত পড়তে পারবে। সে জানত, এর জন্য দরকার অনেক ধৈর্য। তবে রাখালেরা ধৈর্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। আবারো সে বুঝতে পারল, তার ভেড়াগুলোর সাথে থেকে যেসব শিক্ষা পেয়েছে, এই অদ্ভুত দেশেও সেগুলো ব্যবহার করতে পারছে।

'সবকিছুই আসলে এক,' বুড়ো বলেছিলেন।

***

দিনের শুরুতেই ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর ঘুম ভাঙে, আর সেই একই দুশ্চিন্তা ভর করে। একেবারে প্রতিটি দিনই তার এমন হয়। ৩০ বছর ধরে তিনি একই জায়গায় আছেন : একটি পাহাড়ি রাস্তার একেবারে উপরে তার দোকান। ওই পর্যন্ত এখন খুব কম ক্রেতাই যায়। কোনো কিছু পরিবর্তন করার বয়স আর নেই। তিনি মাত্র একটি কাজই শিখেছেন। সেটা হলো ক্রিস্টাল কাচের সামগ্রী বেচাকেনা করা। একসময় অনেক লোক তার দোকানের কথা জানত। আরব সওদাগর, ফরাসি ও ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ, জার্মান সৈন্যরা আসত তার দোকানে। তারা সবাই ছিল ধনী। ওই সময় ক্রিস্টাল বিক্রি ছিল দারুণ ব্যাপার। তিনি ভেবেছিলেন, ধনী হয়ে যাবেন। আর বয়সকালে তার পাশে থাকবে সুন্দরী নারীরা।

কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে তানজিয়ার বদলে গেছে। কাছের সেউতা নগরী তানজিয়ারের চেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠছে। এখানকার ব্যবসা পড়ে গেছে। প্রতিবেশীরা সেখানে সরে গেছে। এখন পাহাড়ি রাস্তায় অল্প কয়েকটা ছোট দোকান রয়ে গেছে। এসব ছোট দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করার জন্য কেউ আর পাহাড়ে চড়তে চায় না।

কিন্তু ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি ক্রিস্টালের জিনিসপত্র বেচাকেনা করে করে জীবনের ৩০টি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন অন্য কিছু করার সময় পেরিয়ে গেছে।

রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ আসা-যাওয়া করা লোকজনকে দেখে দেখে তিনি পুরোটা সকাল কাটিয়ে দেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে এ কাজটি করছেন। জানেন, কখন কোন লোক আসে-যায়। এখন এই দুপুরে খাওয়ার সময়ের ঠিক আগ দিয়ে

ছেলেটা তার দোকানের সামনে দাঁড়াল। স্বাভাবিক পোশাক পরা তার, তবে ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর প্রশিক্ষিত চোখ দুটি ঠিকই দেখতে পেল, ছেলেটার কাছে কেনাকাটা করার মতো একটি টাকাও নেই। তবুও তিনি ছেলেটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

***

দোকানের দরজায় লাগানো একটি নোটিশে বলা হয়েছে, এখানে কয়েকটি ভাষায় কথা বলা যায়। ছেলেটা দেখতে পেল, একটি লোক কাউন্টারের পেছন থেকে বের হয়ে এলেন।

'আমি জানালায় রাখা গ্লাসগুলো পরিষ্কার করে দিতে পারি, যদি আপনি অনুমতি দেন,' ছেলেটা বলল। 'এখন ওগুলো যেমন দেখাচ্ছে, তাতে করে কেউ ওগুলো কিনতে চাইবে না।'

জবাব না দিয়ে তিনি ছেলেটার দিকে তাকালেন।

'বিনিময়ে আপনি আমাকে খাওয়ার জন্য কিছু দেবেন।'

লোকটি এবারো কিছু বললেন না। ছেলেটার মনে হলো, তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। দোটানায় পড়েছেন। ছেলেটার ঝোলায় ছিল তার জ্যাকেট। মরুভূমিতে এই জিনিসের নিশ্চয় দরকার পড়বে না। জ্যাকেটটি দিয়ে সে গ্লাসগুলো পরিষ্কার করতে লেগে গেল। আধা ঘন্টার মধ্যে সে জানালার পাশে রাখা গ্লাসগুলো পরিষ্কার করে ফেলল। সে যখন এই কাজ করছিল, তখন দুই কাস্টমার দোকানে ঢুকে কয়েকটা ক্রিস্টাল কিনল।

ছেলেটা পরিষ্কারের কাজ শেষ করল, তারপর ব্যবসায়ীর কাছে খাবারের জন্য কিছু চাইল। 'চলো আমরা দুপুরের খাবার খাই,' ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী বললেন।

তিনি দরজায় একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর তারা কাছের একটি ছোট ক্যাফেতে গেলেন। সেখানে থাকা একটিমাত্র টেবিলে বসে ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী হাসলেন।

'তোমাকে কিছুই পরিষ্কার করার দরকার ছিল না,' তিনি বললেন। 'পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দেওয়া আছে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে।'

'তাহলে কেন আমাকে কাজটি করতে দিলেন?' ছেলেটা জানতে চাইল।

'কারণ গ্লাসগুলো নোংরা হয়েছিল। তোমার আর আমার - আমাদের দুজনেরই মন থেকে খারাপ চিন্তা ঝেড়ে পরিষ্কার করা দরকার ছিল।'

খেতে খেতে ব্যবসায়ী ছেলেটার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আমার দোকানে কাজ করলে আমার ভালো লাগবে। আজ তোমার কাজ করার সময় দুজন কাস্টমার এসেছে। এটি ভালো লক্ষণ।'

লোকজন শুভ-অশুভ লক্ষণ নিয়ে অনেক কথা বলে, ভাবল রাখালছেলেটা। তবে আসলে তারা জানে না, তারা কী নিয়ে কথা বলছে। ঠিক যেভাবে অনেক

বছরেও বুঝতে পারিনি, আমি শব্দহীন ভাষা দিয়ে আমার ভেড়াগুলোর সাথে কথা বলছি।

'তুমি কি আমার সাথে কাজ করছ তাহলে?' ব্যবসায়ী জানতে চাইলেন।

'আমি কেবল আজকের বাকি সময়টুকু কাজ করতে পারি,' ছেলেটা জবাব দিলো। 'আমি সারা রাত কাজ করব, ভোর পর্যন্ত। আপনার দোকানের প্রতিটি ক্রিস্টাল পরিষ্কার করে ফেলব। বিনিময়ে আপনি কাল মিসরে যাওয়ার মতো টাকা দেবেন।'

ব্যবসায়ী লোকটি হাসলেন। 'এমনকি তুমি পুরো বছরও যদি আমার ক্রিস্টাল পরিষ্কারের কাজ করো... সেইসাথে যদি প্রতিটি বিক্রি থেকে ভালো কমিশনও পাও, তবুও মিসরে যাওয়ার জন্য তোমাকে টাকা ধার করতে হবে। এখান থেকে সেখানে যাওয়ার মাঝখানে হাজার হাজার মাইল মরুভূমি রয়েছে।'

ভয়াবহ নীরবতা নেমে এলো। এই নিঃশব্দতা এমনই যে, মনে হলো পুরো নগরী ঘুমিয়ে আছে। বাজার থেকে কোনো শব্দ আসছে না, দোকানদারদের মধ্যে কোনো দর কষাকষি হচ্ছে না, আজান দিতে কেউ মিনারে উঠছে না। কোনো আশা নেই, কোনো রোমাঞ্চ নেই, কোনো বুড়ো রাজা নেই, নিয়তি বলে কিছু নেই, নেই কোনো গুপ্তধন, নেই কোনো পিরামিড। ছেলেটার আত্মা থমকে যাওয়ায় পুরো দুনিয়া নীরব-নিথর হয়ে গেছে। সে সেখানে বসে ছিল, ফাঁকা চোখে ক্যাফের দরজার দিকে তাকাল। তার মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। ওই মুহূর্তটায় সবকিছু চির দিনের জন্য শেষ হয়ে গেছে।

ব্যবসায়ী লোকটি উদ্বেগের সাথে ছেলেটার দিকে তাকালেন। ওই সকালে যত আনন্দ দেখেছিলেন, সবই হঠাৎ করে কর্পুরের মতো উবে গেছে।

'আমি তোমাকে তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার মতো টাকা দিতে পারি, বাবা আমার,' ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী বললেন।

ছেলেটা কিছুই বলল না। সে উঠে দাঁড়াল, পোশাক ঠিক করল, ঝোলাটি তুলে নিলো।

'আমি আপনার সাথে কাজ করব,' সে বলল।

আবার দীর্ঘ নীরবতার পর সে বলল, 'কয়েকটি ভেড়া কেনার জন্য আমার টাকা দরকার।'



দ্বিতীয় খণ্ড

প্রায় এক মাস ছেলেটা কাজ করল ওই ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর সাথে। তবে বুঝতে পারল, ঠিক যে ধরনের কাজ করে সে আনন্দ পায়, এটি তেমন নয়। ব্যবসায়ী লোকটি পুরো দিন কাউন্টারের আড়ালে বিড়বিড় করে ছেলেটাকে ক্রিস্টাল পিসগুলোর প্রতি সতর্ক থাকতে বলেন, কোনো কিছু যাতে না ভাঙ্গে সে ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন।

কিন্তু তবুও সে চাকরিটি করে গেছে। কারণ ব্যবসায়ী লোকটি বকবক করা বৃদ্ধ হলেও তার সাথে ভালো ব্যবহার করেন, বিক্রি হওয়া প্রতিটি জিনিসের জন্য তাকে ভালো কমিশন দেন। এতে করে সে এর মধ্যেই কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পেরেছে। ওই দিন সকালে সে হিসাব করে দেখল : এমনভাবে কাজ করে গেলে কয়েকটি ভেড়া কিনতে তার পুরো এক বছর কাজ করতে হবে।

'আচ্ছা আমরা ক্রিস্টালের ডিসপ্লে কেস বানাই না কেন?' ছেলেটা বলল ব্যবসায়ীকে। 'এই দোকানের বাইরে রাখব, যাতে পাহাড়ের নিচ দিয়ে চলাফেরা করা লোকজন ওগুলো দেখে এখানে আসতে চায়।'

'আমি এমন কাজ কখনো করিনি,' ব্যবসায়ী জবাব দিলেন। 'লোকজন যাতায়াত করার সময় এতে ধাক্কা খাবে, কাচের জিনিসপত্র ভেঙে যাবে।'

'ঠিক আছে, শুনুন। মাঠে ভেড়া চড়ানোর সময় সাপের কামড়ে দু-একটি মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। কিন্তু এটিই তো ভেড়া আর রাখালের জীবন।'

এমন সময় একজন ক্রেতা ঢুকল দোকানে। সে তিনটি ক্রিস্টাল গ্লাস কিনতে চাইল। ছেলেটার সাথে কথা বাদ দিয়ে কাস্টমারের দিকে নজর দিলেন ব্যবসায়ী। আগের চেয়েও তার বিক্রি ভালো হচ্ছে।... মনে হচ্ছে, তিনি অতীত দিনে ফিরে গেছেন, যখন এ রাস্তাটি ছিল তানজিয়ারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

কাস্টমার বিদায় নেওয়ার পর তিনি ছেলেটাকে বললেন, 'ব্যবসায় আসলেই বাড়ছে। আমি অনেক ভালো করছি। শিগগিরই তুমি তোমার ভেড়া ফিরে পাওয়ার সামর্থ্য পাবে। জীবন থেকে আর বেশি চাও কেন?'

'কারণ আমাদেরকে শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের প্রতি সাড়া দিতেই হয়,' ছেলেটা বলল। সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বোঝাতে না চেয়েই কথাটি সে বলল। তারপর মুখ ফসকে বের হওয়া কথার জন্য তার অনুতাপ হলো, এই ব্যবসায়ীর সাথে তো কোনো দিন ওই রাজার সাক্ষাত হয়নি।

'একে বলে অনুকূল পরিস্থিতির নিয়ম, সূচনাকারীর ভাগ্য। কারণ জীবন চায়, তুমি যেন তোমার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারো', বুড়ো রাজা বলেছিলেন।

তবে ছেলেটা যা বলল, ব্যবসায়ী তা বুঝতে পারলেন। দোকানে ছেলেটার উপস্থিতিই একটি শুভ লক্ষণ। যতই সময় গড়াচ্ছে, তার ক্যাশ বাক্সে তত বেশি বেশি টাকা জমা হচ্ছে। ছেলেটা যত টাকা পাওয়ার যোগ্য, তার চেয়ে বেশি দিয়ে তাকে নিয়োগ করেছিলেন তিনি। তবে এ জন্য তার মধ্যে কোনো আফসোস নেই। কম বিক্রি হবে মনে করে তিনি তাকে বেশি কমিশন দিতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ছেলেটা শিগগিরই ভেড়া কিনে রাখাল জীবনে ফিরে যাবে।

'তুমি কেন পিরামিডে যেতে চেয়েছিলে?' তিনি জানতে চাইলেন। তার আসল লক্ষ্য ছিল ডিসপ্লের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া।

'কারণ আমি সবসময় এর কথা শুনে আসছি,' ছেলেটা জবাব দিলো। তবে সে তার স্বপ্ন নিয়ে একটি কথাও বলল না। গুপ্তধন এখন একটি বেদনাদায়ক স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে এখন এ নিয়ে চিন্তাও করতে চায় না।

'আমি এখানে এমন একজনকেও জানি না, যে স্রেফ পিরামিড দেখার জন্য একটা আস্ত মরুভূমি পাড়ি দিতে চায়,' ব্যবসায়ী বললেন। 'পিরামিড তো কেবল পাথরের স্তূপ। তুমি তো এমন জিনিস তোমার উঠানেও তৈরি করে নিতে পারো।'

'ভ্রমণের স্বপ্ন আপনার কখনো ছিল না,' ছেলেটা বলল। তারপর দোকানে প্রবেশ করা এক ক্রেতার দিকে এগিয়ে গেল।

দু'দিন পর ছেলেটার সাথে ডিসপ্লে নিয়ে কথা বললেন ব্যবসায়ী।

'আমি পরিবর্তন খুব একটা পছন্দ করি না,' তিনি বললেন। 'তুমি আর আমি ওই ধনী ব্যবসায়ী হাসানের মতো নই। তার কোনো কেনাকাটায় ভুল হলে, তাতে তেমন আসে-যায় না। কিন্তু লোকসান আমাদের দুজনকে অনেক কষ্ট দেয়।'

একেবারে খাঁটি কথা, ছেলেটা ভাবল, মন মরাভাবে।

'তাহলে কেন ভাবলে, আমাদের ডিসপ্লে থাকা দরকার?'

'আমি আরো তাড়াতাড়ি আমার ভেড়ার পাল ফিরে পেতে চাই। ভাগ্য যখন আমাদের পক্ষে, তখন আমাদেরকে সেই সুযোগ নিতে হবে। আর ভাগ্যকে সহায়তা করার জন্য সম্ভব সবকিছু করা দরকার। কারণ সে আমাদের সহায়তা করছে। একেই বলে অনুকূলতার বিধান, কিংবা সূচনাকারীর ভাগ্য।

ব্যবসায়ী লোকটি কিছু সময় চুপ থাকলেন। তারপর তিনি বললেন, 'নবীজী আমাদেরকে পবিত্র কোরআন দিয়েছেন। মাত্র পাঁচটি কাজ আমাদের জন্য ফরজ করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সত্যিকার এক আল্লাহতে বিশ্বাস। অন্যগুলো হলো দিনে পাঁচবার নামাজ পড়া, রমজানে রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া।'

তিনি এখানে থামলেন। নবীজীর কথা বলার সময় তার দুই চোখে পানি টলটল করছে। তিনি পরহেজগার মানুষ। অস্থির ধরনের হলেও ইসলামী বিধান মতো জীবনযাপন করতে চান।

'পঞ্চম ফরজটি কী,' জানতে চাইল ছেলেটা।

'দু'দিন আগে তুমি বলেছিলে, সফর করার স্বপ্ন আমার কখনো ছিল না,' ব্যবসায়ী বললেন। 'পঞ্চম ফরজ হলো হজে যাওয়া। জীবনে অন্তত একবার পবিত্র মক্কা নগরীতে যাওয়া আমাদের জন্য ফরজ।

'পিরামিডের চেয়েও মক্কা অনেক দূরে। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমি কেবলই চাইতাম, একটি দোকান করার জন্য টাকা জমাতে। আমি ভাবতাম, একদিন আমি ধনী হবো, তখন মক্কায় যেতে পারব। আমি টাকা কামাই করতে শুরু করলাম। কিন্তু কাউকে দোকানের দায়িত্ব দিয়ে যাওয়ার কাজটি করতে পারেনি। ক্রিস্টাল খুবই কমনীয় জিনিস। অথচ আমার দোকানের সামনে দিয়ে সবসময় লোকজন মক্কার দিকে চলছে। তাদের অনেকে ধনী হজযাত্রী। তারা দাস, উটের সারি নিয়ে কাফেলার সাথে সফর করেছে। তবে বেশির ভাগই আমার চেয়েও গরিব।

'যারাই সেখানে যায়, তারাই হজ করতে পেরে সুখী হয়। তারা হজ করার চিহ্ন তাদের বাড়ির দরজায় টানিয়ে রাখে। গরিব যারা হজ করেছেন, তাদের একজন এক মুচি। এ লোকটি জুতা সেলাই করে দিন চালান। তিনি বলেছিলেন, তিনি মরুভূমি দিয়ে প্রায় এক বছর হেঁটে মক্কায় গিয়েছিলেন। এই সফর তার কাছে কষ্টকর মনে হয়নি। বরং চামড়া কেনার জন্য তানজিয়ারের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ই নাকি তিনি বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।'

'আচ্ছা, আপনি এখন কেন মক্কায় যান না?' ছেলেটা জানতে চাইল।

'কারণ মক্কার চিন্তাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওই ভাবনাই আমাকে একই রকম সব দিন কাটাতে সহায়তা করে। তাকের পর তাকে সাজিয়ে রাখা ওই শব্দহীন ক্রিস্টাল দেখে যাওয়া, একেবারে জঘন্য একই ক্যাফেতে দুপুর আর রাতের খাবার খাওয়াতে যে যন্ত্রণা তা অনুভব করা থেকে রেহাই দিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, আমার স্বপ্ন যদি পূরণ হয়ে যায়, তবে বেঁচে থাকার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাবো না।

'তোমার স্বপ্ন হলো ভেড়ার পাল আর পিরামিড। তবে তোমার আর আমার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেটি হলো তুমি চাও তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে। আমি মক্কা নিয়ে শুধু স্বপ্ন দেখতে চাই। আমি মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার কথা হাজারবার ভেবেছি। কল্পনা করেছি, পবিত্র চত্বরে সাতবার তওয়াফ করে পবিত্র পাথরে চুমু খাব। ওই সময়টাতে কারা আমার পাশে থাকবে, কারা থাকবে আমার সামনে, কাদের সাথে কথা বলব, নামাজ পড়ব, সবই ভেবেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, যেভাবে স্বপ্ন

দেখি, বাস্তব ঘটনা সেভাবে হবে না। স্বপ্ন আর বাস্তবতার ব্যবধানে আমি হতাশায় ডুবে যাব। আর তা-ই আমি স্রেফ স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত থেকেছি।'

ওই দিনই ব্যবসায়ী লোকটি ছেলেটাকে ডিসপ্লে বানাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সবার স্বপ্ন কিন্তু একভাবে পূরণ হয় না।

***

আরো দু'মাস কেটে গেল। ডিসপ্লে সেলফ আরো অনেক কাস্টমারকে ক্রিস্টাল দোকানে টেনে নিয়ে এলো। ছেলেটা হিসাব করে দেখেছে, সে যদি আর ছয় মাস কাজ করে, তবে স্পেনে গিয়ে ৬০টি ভেড়া কিনতে পারবে। আর এক বছরেরও কম সময়ে সে তার ভেড়ার পালকে দ্বিগুণ করতে পারবে। এমনকি সে আরবদের সাথে ব্যবসাও করতে পারবে। কারণ এখন সে তাদের অদ্ভুত ভাষাতেও কথা বলতে পারে। বাজারের ওই সকালের পর থেকে সে আর কখনো উরিম আর থুমিম ব্যবহারের কথা ভাবেনি। কারণ মিসর এখন তার কাছে অনেক দূরের একটি স্বপ্ন। ঠিক যেমন মক্কা ওই ব্যবসায়ীর কাছে। তবে যে কারণেই হোক না কেন, ছেলেটা এখন তার কাজে খুশি। এখন সে সারাক্ষণ কেবল বিজয়ী হিসেবে তারিফায় অবতরণ করার একটি দিনের কথাই ভাবে।

'সবসময় তোমাকে যা অবশ্যই জানতে হবে তা হলো, তুমি কী চাও,' বুড়ো রাজা বলেছিলেন। ছেলেটা তা জানত, সেজন্যই সে কাজ করে যাচ্ছিল। হয়তো তার গুপ্তধনই তাকে এই অদ্ভুত দেশে টেনে এনেছে, এক চোরের সাথে তার দেখা করিয়ে দিয়েছে, একটি পয়সা খরচ না করেই তার ভেড়ার পালকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে।

সে এখন নিজেকে নিয়ে গর্বিত। সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছে : কিভাবে ক্রিস্টালের ব্যবসা করতে হয়, কোনো শব্দ ছাড়াই কিভাবে কথা বলা যায়... এবং শুভ-অশুভ লক্ষণ চিনতে পারা। এক বিকেলে সে পাহাড়ের উপরে একটি লোককে বসে থাকতে দেখল। এত উপরে উঠার পর ক্লান্তি দূর করতে কিছু একটি পান করতে চাইছিল সে। কিন্তু ভালো কোনো জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না। তিনি এ নিয়ে সে অভিযোগ করছিল। শুভ-অশুভ ইঙ্গিতে অভ্যস্ত ছেলেটা বিষয়টি ব্যবসায়ীর নজরে আনল।

'আচ্ছা, যারা পাহাড়ে চড়ে, তাদের জন্য আমরা একটি চায়ের স্টল দিতে পারি না?'

'আশপাশে চা স্টল আছে অনেক,' ব্যবসায়ী জবাব দিলেন।

'কিন্তু আমরা ক্রিস্টাল গ্লাসে চা বিক্রি করতে পারি। লোকজন চা উপভোগ করে কিছু গ্লাস কিনে নিতে পারে। আমি শুনেছি, মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রলুব্ধ করে যে জিনিসটি তা হলো সৌন্দর্য।'

ব্যবসায়ী লোকটি কোনো জবাব দিলেন না। তবে ওই বিকেলেই নামাজ শেষে দোকান বন্ধ করে তিনি ছেলেটাকে তার পাশে বসতে বললেন। ছেলেটার সাথে তিনি হুক্কা টানলেন। আরবদের ব্যবহার করা অদ্ভুত পাইপের এই হুক্কা।

'তুমি আসলে কী চাচ্ছ?' বৃদ্ধ ব্যবসায়ী জানতে চাইলেন।

'আমি আগেই তা আপনাকে বলেছি। আমার ভেড়ার পাল আবার কিনতে চাই। আর তা করার জন্য আমাকে টাকা আয় করতে হবে।'

ব্যবসায়ী নতুন কিছু কয়লা দিলেন হুক্কায়। তারপর গভীর টান দিলেন।

'আমি ৩০ বছর ধরে এই দোকানটা চালাচ্ছি। আমি ক্রিস্টালের ভালো-মন্দ বুঝি, যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা জাগে, তবে তা কেবল ক্রিস্টাল নিয়েই। আমি এর নানা মাত্রা জানি, কিভাবে তা হয়, তা-ও জানি। আমরা ক্রিস্টালে চা পরিবেশন করলে দোকানটি বড় হবে। আর তখন আমার জীবনযাত্রাও বদলাতে হবে।'

'আচ্ছা, সেটি কি ভালো নয়?'

'আমি তো এখনকার অবস্থাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তুমি আসার আগে আমি ভাবতাম, আমার বন্ধুরা চলে গেছে, অথচ একই স্থানে থেকে আমি কত সময় অপচয় করলাম। যারা গেছে, তারা হয় দেউলিয়া হয়ে গেছে কিংবা আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে। বিষয়টি আমাকে খুবই বিষণ্ন করত। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, বিষয়টি খুব খারাপ নয়। দোকানটি আমি যেমন আকারে দেখতে চেয়েছিলাম, এখন ঠিক তেমন অবস্থায় আছে। আমি আর কোনো পরিবর্তন চাই না। কারণ, পরিবর্তনের সাথে কিভাবে খাপ খাওয়াতে হয়, তা আমি জানি না। আমি আমার অবস্থায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

কী বলতে হবে, ছেলেটা বুঝতে পারছিল না। বৃদ্ধ লোকটি বলতে থাকলেন, 'তুমি আসলেই আমার কাছে এক রহমত। আজ আমি এমন কিছু বুঝতে পেরেছি, যা আগে খেয়াল করিনি : কোনো রহমত অগ্রাহ্য করা হলে তা অভিশাপে পরিণত হয়। আমি জীবনে আর কিছুই চাইনি। কিন্তু আমার কাছে পুরোপুরি অজানা হয়ে থাকা সম্পদের দিকে, দিগন্তের দিকে তাকাতে তুমি আমাকে বাধ্য করছ। এখন আমি সেগুলো দেখছি, আর এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার সম্ভাবনা কত বিশাল। তোমার এখানে আসার আগে আমার সত্যিকারের অবস্থা থেকে অনেক বেশি খারাপ মনে করতাম। কারণ আমার পারা উচিত কাজগুলো আমি জানলেও সেগুলো করতে চাইতাম না।'

তারিফার বেকারি দোকানের মালিককে কিছু বলা থেকে বিরত থেকে ভালোই করেছি, ছেলেটা মনে মনে বলল।

তারা আরো কিছু সময় পাইপে তামাক টানলেন। সূর্য তখন ডুবছিল। দু'জনেই কথা বলছিলেন আরবিতে। এই ভাষায় কথা বলতে পেরে ছেলেটা গর্ব

অনুভব করছিল। এমন একসময় ছিল, যখন সে ভাবত, দুনিয়া সম্পর্কে যা কিছু জানা দরকার, সবই তার ভেড়া তাকে শেখাতে পারে। কিন্তু ভেড়া তো তাকে কখনো আরবি শেখাতে পারেনি।

দুনিয়াতে সম্ভবত আরো অনেক কিছু আছে, যেগুলো ভেড়া আমাকে শেখাতে পারে না। বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর কথা বিবেচনা করে ভাবল ছেলেটা। ভেড়ার পাল আসলে সবসময় যা করে, সেটি হলো খাবার আর পানির খোঁজ করা। তবে মনে হয়, তারা আমাকে আসলে কিছুই শেখায়নি, আমিই বরং তাদের কাছ থেকে শিখেছি।

'*মাকতুব*,' ব্যবসায়ী বললেন, অবশেষে।

'এর মানে কী?'

"এটা জানতে হলে তোমাকে আরবে জন্মাতে হবে। তবে তোমার ভাষায় বললে বলা যায় 'নিয়তি।'"

তারপর তিনি হুক্কার কয়লা নিভিয়ে ছেলেটাকে বললেন, সে ক্রিস্টাল গ্লাসে চা বিক্রির কাজ শুরু করতে পারে। অনেক সময় নদীর পানি রোখার সত্যিই কোনো উপায় থাকে না।

***

লোকজন পাহাড়ে উঠল। যখন একেবারে শীর্ষে উঠল, তখন তারা সবাই খুবই পরিশ্রান্ত। তখনই তারা একটি ক্রিস্টাল দোকানে ক্লান্তি-নিবারক মিন্ট টি দেখতে পেল। তারা চা পান করতে চাইল। তাদেরকে চা পরিবেশন করা হলো সুন্দর ক্রিস্টাল গ্লাসে।

'ক্রিস্টালের গ্লাসে চা! আমার বউ তো এমন কিছু কল্পনাও করেনি,' তাদের একজন বললেন। তিনি কিছু ক্রিস্টাল কিনে নিলেন। সেই রাতে তার কয়েকজন অতিথি আপ্যায়ন করার কথা রয়েছে। এমন সুন্দর গ্লাসে চা পরিবেশন করা হলে তারা তো মুগ্ধ হয়ে যাবে। আরেকজন বললেন, ক্রিস্টালে চা পান করা হলে সবসময় আরো মজাদার হয়। কারণ এতে সুগন্ধ থেকে যায়। তৃতীয়জন বললেন, ক্রিস্টাল গ্লাসে জাদুকরি শক্তি থাকায় প্রাচ্যে এ ধরনের পাত্রে চা পানের রেওয়াজ আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। অনেক লোক দোকানটি দেখতে পাহাড়ে উঠল, সেখানে তখন অনেক পুরনো একটি ব্যবসায়ে নতুন কিছুর আমদানি ঘটেছে। ক্রিস্টাল গ্লাসে চা বিক্রির জন্য আরো কিছু দোকান খোলা হয়ে গেল, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই পাহাড়ের উপরে ছিল না। ফলে তাদের ব্যবসা হলো সামান্যই।

শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ীকে আরো দু'জন কর্মী নিয়োগ করতে হলো। তিনি ক্রিস্টালের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ চা-ও আমদানি করতে লাগলেন। নতুন কিছু পাওয়ার ব্যাকুলতায় নারী-পুরুষ তার দোকানে ভিড় করতে লাগল।

আর এভাবেই মাসগুলো কেটে গেল।

***

ছেলেটা ভোর হওয়ার আগে জেগেছিল। আফ্রিকা মহাদেশে সে প্রথম পা রেখেছিল আজ থেকে ১১ মাস ৯ দিন আগে।

সে আরবীয় ঐতিহ্যের বিশেষ সাদা লিনেনের পোশাক পরেছিল। এই দিনটার জন্যই এই পোশাক বিশেষভাবে কিনেছিল সে। মস্তাকাবরণও [*আবায়া*] পরেছিল। মাথা থেকে কাপড়টি যাতে না সরে যায়, সেজন্য উটের চামড়া দিয়ে তৈরি একটি চাকতি তাতে লাগানো ছিল। নতুন চটিও পরেছিল। নীরবে সিঁড়িতে নেমে এলো।

নগরী তখনো ঘুমাচ্ছে। নিজেই স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেল, ক্রিস্টাল গ্লাসে পান করল গরম চা। রোদ-লাগা দরজার সামনে বসে হুক্কায় টান দিতে শুরু করল।

তামাক পান করছিল নীরবে। কিছুই ভাবছিল না, শুনছিল মরুভূমির ঘ্রাণ বয়ে আনা বাতাসের শব্দ। ধূমপান শেষ হলে সে তার একটি পকেটে হাত দিলো। কয়েকটা মুহূর্ত সেভাবেই থাকল, ভাবছিল, কী উঠে আসে হাতে।

পাওয়া গেল এক বান্ডিল কড়কড়ে নোট। এই টাকা দিয়ে ১২০টি ভেড়া, ফেরার টিকেট, আফ্রিকা থেকে তার দেশে পণ্য আমদানির লাইসেন্স কেনা সম্ভব।

সে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল ব্যবসায়ীর ঘুম থেকে জেগে দোকান খোলার। তারপর তারা আরেক দফা চা পানের আয়োজন করতে লাগলেন।

'আমি আজ চলে যাচ্ছি,' বলল ছেলেটা। 'আমার ভেড়া কেনার জন্য যত টাকার দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে। আর মক্কায় যাওয়ার জন্য দরকারি টাকাও আপনার এখন আছে।'

বৃদ্ধ লোকটি কিছুই বললেন না।

'আপনি কি আমাকে দোয়া করবেন?' ছেলেটা জানতে চাইল। 'আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন।' লোকটি তখনো চা বানাচ্ছিলেন, কিছুই বললেন না। তারপর ছেলেটার দিকে ফিরলেন।

'তোমার জন্য আমার গর্ব হয়,' তিনি বললেন। 'তুমি আমার ক্রিস্টাল দোকানে নতুন অনুভূতি নিয়ে এসেছ। তবে তুমি জানো, আমি মক্কায় যাচ্ছি না। ঠিক একইভাবে জানো, তুমি ভেড়ার পাল কিনতে যাচ্ছ না।'

'একথা আপনাকে কে বলল?' ছেলেটা চমকে জানতে চাইল।

'মাকতুব' বৃদ্ধ ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী বললেন।

তারপর তিনি ছেলেটাকে দোয়া করলেন।

***

ছেলেটা তার ঘরে গিয়ে তার মালপত্র গোছগাছ করতে শুরু করল। তিনটি বস্তা ভরে গেল। ঘর ছাড়ার সময় এক কোণায় তার রাখালি আমলের পুরনো ঝোলাটি দেখতে পেল। দলা পাকিয়ে আছে। অনেক দিন এর কথা তার মনেই আসেনি। সে ঝোলা থেকে তার জ্যাকেটটি বের করল। ভাবল, রাস্তায় কাউকে দিয়ে দেবে। তখনই মেঝেতে দুটি পাথর পড়ল। উরিম আর থুমিম।

আর তাতে বুড়ো রাজার কথা মনে পড়ল ছেলেটার। চমকে গেল ভেবে, কত দিন লোকটির কথা তার মনে আসেনি। প্রায় এক বছর সে বিরামহীনভাবে কাজ করেছে। তার একমাত্র ভাবনা ছিল, যথেষ্ট টাকা নিয়ে গর্বের সাথে স্পেনে ফেরা।

'কখনো স্বপ্ন দেখা বন্ধ করো না,' বুড়ো রাজা বলেছিলেন। 'শুভ-অশুভ ইঙ্গিত মেনে চলো।'

ছেলেটা উরিম আর থুমিম কুড়িয়ে নিলো। কাছেই বুড়ো রাজা আছেন - এমন অদ্ভুত সেনসেশন আবারো ভর করল। সে এক বছর কঠোর পরিশ্রম করেছে, লক্ষণ বলছে, এখনই যাওয়ার সময়।

আমি আগে যা করতাম, ঠিক সেখানেই ফিরে যাচ্ছি, ছেলেটা ভাবল। অবশ্য যদিও ভেড়ারা আমাকে আরবি শেখাতে পারেনি।

তবে ভেড়ারা তাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখিয়েছে : পৃথিবীতে একটি ভাষা আছে। এই ভাষা সবাই বুঝতে পারে। দোকানের অবস্থা ভালো করার পুরোটা সময় সে এই ভাষাই ব্যবহার করেছে। এটি উদ্যমের ভাষা, এর সাথে থাকে ভালোবাসা আর উদ্দেশ্যের সাথে কিছু অর্জনের স্বপ্ন। এটি বিশ্বাসের আর কাঙ্ক্ষিত বস্তু অনুসন্ধানের অংশ। তানজিয়ার এখন আর তার কাছে নতুন কোনো নগরী নয়। তার মনে হলো, সে যখন এ স্থানটি জয় করতে পেরেছে, সে বিশ্বও জয় করতে পারবে।

'তুমি যখন কিছু চাইবে, তখন তা পেতে পুরো মহাবিশ্ব তোমাকে একযোগে এগিয়ে আসবে,' বলেছিলেন বুড়ো রাজা।

বুড়ো রাজা কিন্তু চুরি হওয়া কিংবা সীমাহীন মরুভূমি সম্পর্কে কিছু বলেননি। ওইসব লোকের কথাও বলেননি, যারা তাদের স্বপ্ন সম্পর্কে জানে, কিন্তু পূরণ করতে চায় না। বুড়ো রাজা তাকে বলেননি, পিরামিড স্রেফ পাথরের স্তুপ, কিংবা এটি যে কেউ তার বাড়ির উঠানেই বানাতে পারে। আর তিনি একথাও বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তোমার কাছে যখন আগের চেয়েও বড় ভেড়ার পাল কেনার মতো টাকা হবে, তখন তোমার উচিত তা কেনা।

ছেলেটা তার ঝোলা কুড়িয়ে অন্যান্য জিনিসের সাথে রেখে দিলো। সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। দেখতে পেল, এক বিদেশী দম্পতি ব্যবসায়ীর দোকানে অপেক্ষা করছে, অন্য দুই ক্রেতা দোকানের কাছে হেঁটে হেঁটে ক্রিস্টালের গ্লাসে চা পান করছে। সকালে সাধারণত যে ধরনের ভিড় থাকে, এখন তার চেয়ে বেশিই দেখা যাচ্ছে। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে প্রথমবারের মতো দেখল, বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর চুল একেবারে বুড়ো রাজার চুলের মতো। তানজিয়ারে তার প্রথম দিনে মিষ্টান্ন বিক্রেতার হাসির কথা তার মনে পড়ল। তখন তার কাছে খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না, যাওয়ার মতো জায়গা ছিল না। ওই হাসিও বুড়ো রাজার হাসির মতো।

বিষয়টি মোটামুটিভাবে এমন যেন তিনি এখানে ছিলেন এবং তার চিহ্ন রেখে গেছেন, সে ভাবল। অথচ এসব লোকের কারোরই বুড়ো রাজার সাথে দেখা হয়নি। বিষয়টি অন্যভাবে বলা যায়, তিনি বলেছিলেন, যারা তাদের নিয়তিকে ধরার চেষ্টা করে, তিনি তাদের সবসময় সাহায্য করার জন্য হাজির হন।

সে ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীকে কিছু না বলে বিদায় নিলো। সেখানে থাকা অন্য লোকজনের সামনে কাঁদতে চাইল না। সে স্থানটি এবং ভালো ভালো যা কিছু শিখেছে, সব কিছু হারাতে চলেছে। তার পরও সে এখন নিজের ব্যাপারে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী। তার মনে হলো, সে বিশ্বজয় করতে পারবে।

'আমি কিন্তু আমার পরিচিত মাঠেই ফিরে যাচ্ছি। এখন থেকে আবার আমার ভেড়ার পালের যত্ন নেব,' সে জোর দিয়ে মনে মনে বলল। তবে এই সিদ্ধান্ত তার নিজেরই পছন্দ হলো না। সে একটি পুরো বছর তার একমাত্র স্বপ্নকে সত্যি পরিণত করার জন্য কাজ করেছে। অথচ এখন সেই স্বপ্নই মিনিটে মিনিটে আগের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠছে। এর কারণ হয়তো এটি তার আসল স্বপ্ন নয়।

কে জানে... হয়তো ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর মতো হওয়াই অনেক ভালো। তার মতো কখনো মক্কায় না যাওয়া, কেবল সেখানে যাওয়ার কথা ভেবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া, সে ভাবল। আবার নিজেকে বোঝাতে চাইল। তবে তার হাতে ধরা ছিল উরিম আর থুমিম। পাথর দুটি তার মধ্যে বুড়ো রাজার শক্তি আর ইচ্ছা সঞ্চারিত করছিল। এসব ভাবতে ভাবতে এখানে আসার প্রথম দিন সে যে বারে ঢুকেছিল, সেখানেই প্রবেশ করল। এটা কাকতালীয় ঘটনা নাকি শুভ-অশুভ ইঙ্গিত? সে চমকে গিয়ে ভাবল। আজ বারে ওই চোর নেই। মালিক তার জন্য এক কাপ চা নিয়ে এলো।

আমি সবসময়ই রাখাল জীবনে ফিরে যেতে পারি, ভাবল ছেলেটা। ভেড়াদের কিভাবে যত্ন নিতে হয়, তা আমি শিখেছি। কাজটি এখনো ভুলিনি। কিন্তু মিসরের পিরামিডে যাওয়ার সুযোগ আমি আর কখনো পাবো না। বুড়ো লোকটি সোনার বক্ষবন্ধনী পরেছিলেন, তিনি আমার অতীত জানতেন। তিনি ছিলেন আসলেই রাজা, জ্ঞানী রাজা।

আন্দালুসিয়ার পাহাড় মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। কিন্তু তার আর পিরামিডের মধ্যে রয়েছে একটি পুরো মরুভূমি। অবশ্য পরিস্থিতি অন্যভাবে ভাবার কথা মনে পড়ল ছেলেটার। সে আসলে তার গুপ্তধনের দুই ঘণ্টা কাছে চলে এসেছে।... তবে দুই ঘণ্টা যে আসলে বড় হয়ে পুরো একটি বছরই হয়ে গেছে, তা কোনো ব্যাপারই নয়।

আমি জানি, কেন আমি আমার ভেড়ার পালের কাছে ফিরে যেতে চাই, সে ভাবল। আমি ভেড়া বুঝি; তারা কোনো সমস্যা নয়, তারা ভালো বন্ধু হতে পারে। অন্য দিকে মরুভূমি বন্ধু হতে পারে কি-না তা আমি জানি না। আর এই

মরুভূমিতেই আমাকে আমার সম্পদ খুঁজতে হবে। আমি খুঁজে না পেলে যেকোনো সময় বাড়ি ফিরে যেতে পারি। শেষ কথা হলো, আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকা আছে। প্রয়োজনীয় সময়ও আছে। তবে কেন বের হবো না?

হঠাৎ করে প্রবল আনন্দ অনুভব করল সে। রাখাল সে হতে পারে চাইলেই। সে আবার যেকোনো সময় ক্রিস্টাল সেলসম্যান হতে পারে। দুনিয়ায় হয়তো আরো গুপ্তধন থাকতে পারে, কিন্তু তার একটি স্বপ্ন আছে, তার দেখা হয়েছিল এক রাজার সাথে। এমনটি আর কারো সাথেই ঘটেনি!

বার থেকে বের হওয়ার সময় ছেলেটা পরিকল্পনা করে ফেলল। ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীকে যে লোক ক্রিস্টাল সরবরাহ করত, তার কথা মনে পড়ল। ওই লোক কাফেলার সাথে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ক্রিস্টাল আমদানি করত। ছেলেটার হাতে তখন উরিম আর থুমিম। এ পাথর দুটির কারণে সে আবার তার গুপ্তধনের পথে ফিরে এলো।

'যখন কেউ তার স্বপ্নের দিকে ছুটে চলে, আমি সবসময় তার সাথে থাকি,' বলেছিলেন বুড়ো রাজা।

এ জন্য যা করতে হবে তা হলো ওই সরবরাহকারীর গুদামে গিয়ে খোঁজ করা। সেখানে গিয়ে তাকে জানতে হবে, পিরামিড কি আসলেই ওই দূরের পথে?

***

ইংরেজ ভদ্রলোকটি যেখানে এক বেঞ্চে বসেছিলেন, পশু, ঘাম আর ধুলার গন্ধে স্থানটি একাকার হয়ে গিয়েছিল। জায়গাটির কিছু অংশ ছিল গুদাম, কিছু অংশ ছিল খোঁয়াড়। আমি কখনো এ ধরনের জায়গায় আসার কথা চিন্তাও করেনি। একটি রসায়নশাস্ত্রের জার্নালের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি ভাবছিলেন। ১০ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে এখন আমি এই খোঁয়াড়ে।

কিন্তু না এসে তার আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি শুভ-অশুভ ইঙ্গিতে বিশ্বাস করেন। তার পুরো জীবন এবং সব গবেষণার লক্ষ্য ছিল মহাবিশ্বের একমাত্র প্রকৃত ভাষা খুঁজে পাওয়া। প্রথমে তিনি গবেষণা করেছেন এসপারেন্টো [কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষা] নিয়ে, তারপর বিশ্বের ধর্মগুলো নিয়ে। আর এখন তিনি গবেষণায় মেতে আছেন রসায়নে। তিনি এসপারেন্টো ভাষায় কথা বলতে পারেন, প্রধান প্রধান সব ধর্মও জানেন খুব ভালোভাবে। কিন্তু এখনো তিনি আলকেমিস্ট হতে পারেননি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নের জট খুলেছেন। কিন্তু গবেষণাই তাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেছে, তারপর দৃশ্যত আর কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। কোনো আলকেমিস্টের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। আলকেমিস্টরা আশ্চর্য মানুষ। তারা কেবল নিজেদের নিয়েই ভাবেন, কাউকেই বলতে গেলে সাহায্য করেন না। কে জানে, হয়তো তারা তাদের 'সেরা সৃষ্টি' তথা 'পরশ পাথর' আবিষ্কারই করতে পারেননি। এ কারণেই তারা নিজেদের লোকচক্ষুর অগোচরে রেখেছেন!

'পরশ পাথরের' খোঁজ করতে গিয়ে তিনি এর মধ্যেই বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। বিশ্বের সেরা সেরা লাইব্রেরির চষে ফেলেছেন। আলকেমির ওপর বিরলতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব বই তিনি কিনেছেন। একবার তিনি পড়েছিলেন, অনেক বছর আগে এক বিখ্যাত আরব আলকেমিস্ট ইউরোপ গিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তার বয়স ছিল দুই শ' বছরের বেশি। তিনি 'পরশ পাথর' আর 'আবে হায়াত' আবিষ্কার করেছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। এই কাহিনী পড়ে ইংরেজ ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে এটিকে গালগল্পের চেয়ে বেশি কিছু ভাবেননি। তবে তার চিন্তার মোড় ঘুরে যায় মরুভূমিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালিয়ে দেশে ফেরা তার এক বন্ধুর কথায়। তিনিই তাকে ব্যতিক্রমী শক্তির অধিকারী এক আরব লোকের সন্ধান দিয়েছিলেন।

'তিনি বাস করেন আল-ফেয়ুম মরুদ্যানে,' তার বন্ধু বলেছিলেন। 'সবাই বলে তার বয়স ২০০ বছর। তিনি যেকোনো ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে পারেন।'

ইংরেজ ভদ্রলোকটি তার উত্তেজনা গোপন করতে পারেননি। তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত সব কর্মসূচি বাতিল করে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সব বইপত্র জড়ো করে রওনা হয়ে গেলেন। এখন তিনি এখানে, ধুলাময়, দুর্গন্ধে ভরা গুদামঘরে বসে আছেন। বাইরে একটি বিশাল কাফেলা সাহারা পাড়ি দেওয়ার আয়োজন করছে। এটির আল-ফেয়ুম দিয়ে যাবে বলে কথা রয়েছে।

আমি যাচ্ছি ওই শালার আলকেমিস্টকে খুঁজতে, ইংরেজ ভদ্রলোকটি ভাবছিলেন। আর তাতে পশুগুলোর ভয়াবহ গন্ধ কিছুটা সহনীয় হলো।

এক তরুণ আরব, বোঝা নামিয়ে সেখানে এলো, তাকে সালাম দিলো।

'আপনি কোথায় যাবেন?' তরুণ আরব জানতে চাইল।

'আমি মরুভূমিতে যাচ্ছি,' লোকটি জবাব দিয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন। তিনি এখন ফালতু কথা বলতে চান না। বছরের পর বছর ধরে তিনি যা শিখেছেন, এখন সেসব ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। আলকেমিস্ট নিশ্চয় তাকে পরীক্ষা করবেন।

তরুণ আরব একটি বই বের করে পড়তে শুরু করল। বইটি স্প্যানিশে লেখা। ভালো তো, ভাবলেন ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনি আরবির চেয়ে স্প্যানিশ ভালো পারেন। আর এ ছেলেটাও যদি আল-ফেয়ুম যায়, তবে ফুসরত পেলে কথা বলার মতো কাউকে পাওয়া যাবে।

***

'আশ্চর্য তো,' ছেলেটা বলল, সে আরেকবার বইটির শুরুতে থাকা কবর দেওয়ার দৃশ্যটি পড়ার চেষ্টা করছিল। 'আমি দুই বছর ধরে এই বই পড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনো এ কয়েক পৃষ্ঠার বেশি যেতে পারিনি।' এখন তো কোনো রাজা এসে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু তবুও পড়া এগুচ্ছে না।

সে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নিয়ে এখনো তার মধ্যে সংশয় রয়ে গেছে। তবে একটি বিষয় সে বুঝতে পেরেছে : সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো কাজ শুরু করা মাত্র। কেউ যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সত্যি সত্যিই সে যেন প্রবল স্রোতে ঝাঁপ দিলো। সেই স্রোত তাকে এমন সব জায়গায় নিয়ে যাবে, যা সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কল্পনাও করতে পারেনি।

আমি যখন গুপ্তধন খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তখন মনেও হয়নি, এটা আমাকে ক্রিস্টাল শপে কাজ করার দিকে নিয়ে যাবে, সে ভাবল। আর এই কাফেলায় যোগ দেওয়া হয়তো আমার সিদ্ধান্ত। কিন্তু এটা যেখানে যাচ্ছে, সেখানে যাওয়া আমার কাছে রহস্যময় মনে হতে পারে।

ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন কাছেই, বই পড়ছেন। তিনি মনে হচ্ছে, মিশুক প্রকৃতির নন। ছেলেটা যখন সেখানে প্রবেশ করেছিল, তখন তিনি বিরক্তিকরভাবে তাকিয়েছিলেন। অথচ তারা বন্ধুও হতে পারত। কিন্তু ভদ্রলোক তো কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

বই বন্ধ করল ছেলেটা। তার মনে হলো, সে এমন কিছু করতে চায় না, যাতে এই ইংরেজ ভদ্রলোকের মতো অমিশুক মনে হয় তাকে। সে তার পকেট থেকে উরিম আর থুমিম বের করল। তারপর ওই দুটি নিয়ে খেলতে শুরু করল।

ভদ্রলোক চিৎকার করে বলে ওঠলেন, 'উরিম আর থুমিম!'

ছেলেটা চোখের পলকে পাথর দুটি তার পকেটে চালান করে দিলো।

'এগুলো বিক্রি করার জন্য নয়,' সে বলল।

'এগুলো তেমন দামি নয়,' ইংরেজ ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন। 'এগুলো স্রেফ রক ক্রিস্টাল থেকে তৈরি। পৃথিবীর বুকে এ ধরনের কোটি কোটি রক ক্রিস্টাল আছে। কিন্তু যারা এসব জিনিস চেনে, তারা জানে, এগুলোকে বলে উরিম আর থুমিম। আমি জানতাম না, এগুলো দুনিয়ার এই অংশেও আছে।'

'এগুলো আমাকে উপহার দিয়েছেন এক রাজা,' ছেলেটা বলল।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। তিনি বরং নিজের পকেটে হাত দিলেন, বের করলেন দুটি পাথর। এ দুটিও ছেলেটার কাছে থাকা পাথরের মতো।

'তুমি কি কোনো রাজার কথা বলেছিলে?' তিনি জানতে চাইলেন।

'আমার অনুমান, আপনি বিশ্বাস করবেন না যে আমার মতো এক রাখালের সাথে কোনো রাজা কথা বলতে পারেন,' সে বলল। এখন সে চাইছিল কথা বন্ধ করে দিতে।

'মোটেই না। এই রাখালরাই তো প্রথম একজন রাজাকে শনাক্ত করেছিল, যখন বাকি দুনিয়া তাকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল। তাই রাজারা রাখালদের সাথে কথা বলবেন, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে।'

তিনি বলে চললেন। তবে তার ভয় ছিল, তিনি যা বলছেন, ছেলেটা হয়তো তা বুঝতে পারবে না। 'বিষয়টি আসলে আছে বাইবেলে। এই বইই আমাকে উরিম

আর থুমিম সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। এই পাথরই কেবল ঈশ্বরের অনুমোদিত ভবিষ্যৎ-কথন করতে পারে। পাদ্রিরা সোনার বর্মে করে এগুলো বহন করেন।'

গুদামঘরে আসতে পেরে ছেলেটা হঠাৎ করে খুশি হয়ে গেল।

'হয়তো এটি কোনো শুভ-অশুভ লক্ষণ' ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন কিছুটা উচ্চস্বরে।

'আপনাকে কে শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে বলেছে?' ছেলেটা এখন আরো বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেছে।

'জীবনের সবকিছুই একটি শুভ-অশুভ লক্ষণ,' বললেন ইংরেজ ভদ্রলোকটি। তিনি এখন তার জার্নাল পড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। 'সবাই বোঝে এমন একটি সার্বজনীন ভাষা ছিল। এখন ভাষাটি হারিয়ে গেছে। আমি সেই সার্বজনীন ভাষাও খুঁজছি। এ কারণেও আমি এখানে এসেছি। আমাকে এমন একজনকে খুঁজে বের করতে হবে, যিনি সেই সার্বজনীন ভাষা জানেন। তিনি হলেন আলকেমিস্ট।'

তাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল গুদামঘরের মালিকের আগমনে।

'ভাগ্য ভালো, তোমাদের দুজনেরই,' মোটা আরব লোকটি বললেন। 'আজই আল-ফেয়ুমে একটি কাফেলা যাত্রা করছে।'

'কিন্তু আমি তো যাচ্ছি মিসরে,' ছেলেটা বলল।

'আল-ফেয়ুম তো মিসরেই,' আরব লোকটি বললেন। 'তুমি কোন পদের আরব হে?'

'শুভ লক্ষণ,' আরব লোকটি চলে যাওয়ার পর বললেন ইংরেজ ভদ্রলোক। 'যদি পারি তো কেবল *ভাগ্য* আর *কাকতালীয় ঘটনা* শব্দ নিয়েই একটি বিশাল বিশ্বকোষ লিখে ফেলব। ওইসব শব্দ দিয়েই সার্বজনীন ভাষা লেখা হয়েছে।'

তিনি ছেলেটাকে বললেন, তার হাতে থাকা উরিম আর থুমিম নিয়ে তার সাথে দেখা হওয়ার মধ্যে কাকতালীয় কিছু নেই। তিনি ছেলেটার কাছে জানতে চাইলেন, সে-ও কী আলকেমিস্টের খোঁজে বের হয়েছে?'

'আমি গুপ্তধন খুঁজছি,' ছেলেটা জবাব দিলো। তবে বলে ফেলার জন্য সাথে সাথেই তার অনুশোচনা হলো। কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে এর কোনো গুরুত্বই ধরা পড়ল না।

'একদিক থেকে আমিও তা-ই করছি,' তিনি বললেন।

'কিন্তু আলকেমিস্ট কী, সেটিই তো আমি জানি না,' ছেলেটা বলল। ঠিক তখনই গুদামঘরের মালিক তাদেরকে বাইরে বের হতে বললেন।

***

'আমি এই কাফেলার নেতা,' কালো চোখের এক দাড়িওয়ালা লোক বললেন, 'আমার সাথে থাকা এই কাফেলার প্রতিটি লোকের জীবন আর মরণের মালিক আমি। মরুভূমি আসলে এক খেয়ালি নারী, অনেক সময় সে মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয়।'

সেখানে ছিল প্রায় দুই শ' মানুষ, চার শ' উট, ঘোড়া, খচ্চর, পাখ-পাখালি। তাদের মধ্যে নারী আছে, শিশুও আছে। পুরুষদের মধ্যে অনেকের কোমরে তরবারি, কাঁধে রাইফেল বাঁধা। ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে কয়েকটি স্যুটকেস ভর্তি বই। হট্টগোলে কারো কথাই কেউ শুনতে পারছে না। কী বলতে চান সেটি একেবারে সবাইকে বোঝানোর জন্য নেতাকে কথাগুলো কয়েকবার বলতে হলো।

'এখানে নানা ধরনের লোকজন আছে, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ঈশ্বর আছেন। তবে আমি যে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করি তিনি হলেন আল্লাহ। আমি তাঁর নামে শপথ করছি, এই মরুভূমি আবারো পাড়ি দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। তবে আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজের বিশ্বাস করা ঈশ্বরের নামে শপথ করাতে চাই, যা-ই ঘটুক না কেন, তোমরা আমার হুকুম মেনে চলবে। মরুভূমিতে অবাধ্যতা মানে মৃত্যু।'

জনতার মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ঈশ্বরের নামে শপথ করল। ছেলেটা যিশুখ্রিস্টের নামে শপথ করল। ইংরেজ ভদ্রলোক কিছুই বললেন না। গুঞ্জনধ্বনি স্বাভাবিক শপথ গ্রহণের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী হলো। নিরাপদে মরুভূমি পাড়ি দিতে সহায়তা পাওয়ার জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল লোকজন।

বিউগলে দীর্ঘ সুর শোনা গেল, সবাই বাহনে চড়ে বসল। ছেলেটা ও ইংরেজ ভদ্রলোক উট কিনেছেন। কোনো মতে তারা তাতে চড়ে বসলেন। ইংরেজ ভদ্রলোকের উটের পিঠে কয়েক বাক্স বই। উটটির কষ্টের জন্য ছেলেটার দুঃখ হলো।

'কাকতালীয় বলে কিছু নেই,' ইংরেজ লোকটি বললেন। গুদামঘরে যেখানে তাদের কথা বন্ধ হয়েছিল, তিনি সেখান থেকেই শুরু করলেন। 'আমার এখানে থাকার কারণ হলো আমার এক বন্ধু এমন এক আরবের কথা শুনেছিল, যে...'

কাফেলা তখন চলতে শুরু করেছিল। ফলে ইংরেজ ভদ্রলোক কী বলছিলেন, সেটা শোনা হয়ে পড়ল অসম্ভব। তার পরও ছেলেটা বুঝতে পারল তিনি কী বলতে চাইছেন : একটির সাথে আরেকটিকে জুড়ে দেয় যে রহস্যময় শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খলটিই তাকে রাখাল বানিয়েছে, তাকে দুবার স্বপ্নটি দেখিয়েছে, তাকে আফ্রিকার কাছাকাছি একটি শহরে নিয়ে এসেছে, এক রাজার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার সবকিছু চুরি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এবং...

কেউ যখন তার নিয়তিকে পূরণ করার কাছাকাছি পৌঁছে, ওই নিয়তি তখন আরো বেশি করে তার অস্তিত্বশীল হওয়ার সত্যিকারের কারণে পরিণত হয়, ছেলেটা ভাবল।

কাফেলা পূর্ব দিকে চলছিল। তারা সকালে চলতে থাকে, সূর্য যখন মাথার ওপর গনগনে রোদ ছড়ায়, তখন যাত্রাবিরতি ঘটে। বিকেলে আবার চলা শুরু হয়। ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে ছেলেটার কথা বলার সুযোগ হয় কমই। তিনি প্রায় সবসময় বইপত্রে ডুবে থাকেন।

ছেলেটা নীরবে মরুভূমি দিয়ে পশু আর মানুষের এগিয়ে যাওয়া দেখতে লাগল। তারা যাত্রা করার সময় যেমন ছিল, এখন সবকিছুই বদলে গেছে : তখন ছিল হইচই-চিৎকার-চেঁচামেচি, বিভ্রান্তি, শিশুরা কাঁদছিল, পশুগুলো ডাকছিল, এর সাথে মিশে গিয়েছিল গাইড আর সওদাগরদের উৎকণ্ঠিত আদেশ-নিষেধ।

কিন্তু মরুভূমিতে শব্দ আছে কেবল অবিনাশী বাতাসের আর ঘোড়া-উটের খুড়ের। এমনকি গাইডরাও একে অপরের সাথে কথা বলে খুবই কম।

'আমি অনেকবার এসব বালি অতিক্রম করেছি,' এক উটচালক একদিন রাতে বলল। 'কিন্তু মরুভূমি এত বিশাল আর দিগন্তগুলো এত বিস্তৃত যে মানুষ যে অতি ক্ষুদ্র, এগুলো ওই অনুভূতিই সৃষ্টি করে। এ কারণেই নীরব থাকা দরকার।'

ছেলেটা অন্তর থেকে বুঝতে পারল, উটচালক কী বলতে চাচ্ছে। যদিও ছেলেটা আগে কখনোই মরুভূমিতে পা ফেলেনি। যখনই সাগর, আগুন দেখত, সে নীরব হয়ে যেত। তাদের প্রচণ্ড সহজাত শক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ে।

'আমি ভেড়াদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, আমি ক্রিস্টাল থেকে অনেক কিছু শিখেছি,' সে ভাবল। আমি মরুভূমি থেকেও কিছু শিখতে পারি। প্রবীণ আর জ্ঞানীর মতো ভাবনা বলে মনে হলো।

বাতাস কখনো থামে না। ছেলেটার মনে পড়ল তারিফা দুর্গে তার বসে থাকার কথা। সেদিনও এমন বাতাস তার মুখে আছড়ে পড়েছিল। আর সেটিই তাকে তার ভেড়ার উল ছাড়ানোর কথা মনে করিয়ে দিলো।... ভেড়াগুলো এখনো আন্দালুসিয়ার প্রান্তরগুলোতে খাবার আর পানি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তারা যেমন করে সবসময়।

'ওগুলো আর আমার ভেড়া নয়,' সে মনে মনে বলল। এ নিয়ে তার মধ্যে কোনো ধরনের স্মৃতিকাতরতার সৃষ্টি হলো না। 'ওগুলো নিশ্চয় তাদের নতুন রাখালের কাছে আছে, সম্ভবত আমার কথা তারা ভুলেই গেছে। ভালোই। ভেড়ার মতো সৃষ্টিগুলো সবসময় সফর করতে থাকে, তারা চলতে জানে।'

সে দোকানির মেয়ের কথা ভাবল। সে নিশ্চিত, হয়তো মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। হয়তো কোনো বেকারি মালিক কিংবা কোনো রাখালের সাথে তার বিয়ে হয়েছে, যে পড়তে পারে এবং তাকে দারুণ সব মজার গল্প বলতে পারে। মজার গল্প কেবল সে একা বলতে পারে, এমন নয়। তবে সে উটচালকের মন্তব্যের মর্মবাণী বুঝতে পারার নিজের সহজাত ক্ষমতায় উদ্দীপ্ত হলো। হয়তো সে নিজেও অতীত ও বর্তমানের সব লোকের কাছে বোধগম্য সার্বজনীন ভাষা শিখতে শুরু করে দিয়েছে। তার মা বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য বলতেন : 'যথার্থ অনুমান।' ছেলেটা

বুঝতে শুরু করল, সহজাত ক্ষমতার মানে হলো সত্যিকার অর্থেই জীবনের সার্বজনীন স্রোতে আত্মার অপ্রত্যাশিতভাবে প্লাবিত হওয়া। এই স্রোতেই সব মানুষের ইতিহাস মিশে থাকে। সবকিছু এখানে লেখা থাকে বলে আমরা সবকিছু জানতে পারি।

'*মাকতুব*,' ছেলেটা বলল। ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর কথা তার মনে পড়ল।

মরুভূমির অনেক অংশ বালিতে পরিপূর্ণ, বাকি অংশ পাথরে ভর্তি। সামনে বড় কোনো পাথর পড়লে তাদেরকে সেটির পাশ দিয়ে যেতে হয়, যদি পাথুরে এলাকা হয়, তবে বড় ধরনের বাঁক নিতে হয়। বালু খুব মিহি হলে পশুগুলোর পা দেবে যায়। তখন শক্ত বালিযুক্ত স্থান দিয়ে পথ চলতে হয়। অনেক সময় শুকনা হ্রদের লবণে ঢাকা পথ পাড়ি দিতে হয়। পশুগুলো ওইসব পথে চলতে চায় না, কষ্ট হয়। উটচালকেরা তখন নামতে বাধ্য হয়, বোঝাগুলোও নামিয়ে নেয়। এ ধরনের হেঁয়ালিভরা পথে উটচালকেই বোঝা বইতে হয়। ওই পথটুকু পাড়ি দেওয়ার পর আবার উটে বোঝা চাপান হয়। গাইড অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা মারা গেলে উটের চালকেরা তখন লটারি করে নতুন কাউকে নিয়োগ করে।

তবে এসবের সবই হয় একটি মাত্র মৌলিক কারণে : কতগুলো বাঁক কাটাতে হবে কিংবা কতটুকু পথ সরে যেতে হবে, তা কোনো ব্যাপারই নয়, কাফেলাকে ক্যাম্পাস বিন্দুতে আবার আগের পথে ফিরে আসতে হয়। বাধা দূর হওয়ামাত্র সে তার পথে চলে আসে, আকাশের তারকা মরুদ্যানের অবস্থান ঠিক করে দেয়। ভোরের আকাশে ধ্রুব তারকা দেখে বুঝতে পারে যে তারা পানি, খেজুরগাছ, আশ্রয় এবং অন্য লোকজনের দিকে ঠিক পথেই চলছে। একমাত্র ইংরেজ ভদ্রলোকই এসবের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। তিনি বেশির ভাগ সময় বইপত্রেই নিমগ্ন থাকেন।

ছেলেটার হাতেও বই ছিল। সে সফরের প্রথম কয়েকটা দিন বইটি পড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার মনে হয়েছে, এর চেয়ে কাফেলার চলা লক্ষ করা এবং বাতাসের শব্দ শোনা অনেক বেশি উপভোগ্য। কিছু সময়ের মধ্যে সে তার উটকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণীটির সাথে সম্পর্ক গড়ে নিলো, বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অবশ্য ছেলেটার মনে একটি কুসংস্কারও দানা বেঁধেছে। যতবারই বইটি খুলবে, ততবারই সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে পারবে। তার পরও তার কাছে বইকে অপ্রয়োজনীয় বোঝা মনে হয়েছে।

উটচালকের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠছে। তারা পাশাপাশি চলছে। রাতে আগুনের পাশে বসে ছেলেটা তার রাখাল জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী চালককে বলে।

এসব কথোপকথনের একপর্যায়ে চালকটি তার নিজের গল্প শোনায়।

সে বলে : 'আমি বাস করতাম আল কাইরুমের কাছে। আমার বাগান ছিল, সন্তান ছিল, স্ত্রী ছিল। জীবনটা এমন ছিল, মনে হচ্ছিল, মারা যাওয়ার আগে এই

জীবন বদলাবে না। এক বছর ফসল হলো সবচেয়ে ভালো। আমরা সবাই একসাথে মক্কা গেলাম। আমি আমার জীবনের একমাত্র অপূর্ণ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পেরে তৃপ্ত হলাম। আমি এখন সুখে মরতে পারব। আর এই অনুভূতি আমাকে সুখী করল।

'কিন্তু একদিন পৃথিবী কাঁপতে শুরু করল। নীলনদ উপচে এলো পানি। আমরা নিজেরা এমন বিপর্যয়ে পড়ব তা কখনো ভাবতেই পারিনি। আমার প্রতিবেশীদের ভয় হলো, বন্যায় তাদের সব জলপাই গাছ শেষ হয়ে যাবে। আমার স্ত্রীর আশঙ্কা হলো, আমরা আমাদের সন্তানদের হারিয়ে ফেলব। মনে হলো, আমার মালিকানায় থাকা সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

'এলাকাটি ধ্বংস হয়ে গেল, আমাকে বাঁচার জন্য অন্য কোনো জীবিকা খুঁজে নিতে হলো। এ কারণেই আমি এখন উটচালক। তবে এই বিপর্যয় আমাকে আল্লাহর বাণী বুঝতে শিখিয়েছে : অজানাকে ভয় করার দরকার নেই মানুষের, যদি প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার সামর্থ্য তাদের থাকে।

'আমাদের যাকিছু আছে- জীবন, মালামাল ও সম্পত্তি - সবই হারানোর ভয় থাকে আমাদের। তবে সব ভয়ই উবে যায়, যখন আমরা বুঝতে পারি, আমাদের জীবনের কাহিনী এবং পৃথিবীর ইতিহাস একই হাতে লেখা হয়েছে।'

অনেক সময় তাদের কাফেলার সাথে দেখা হয় অন্য কাফেলার। সবার কাছেই এমন কিছু থাকে, যা অন্যদের দরকার, কারণ সবই এক হাতে লেখা হয়েছে। তারা আগুনের পাশে বসে, উটচালকেরা ঝড়ের তথ্য বিনিময় করে। তারা মরুভূমি নিয়ে নানা গল্প করে।

অনেক সময় তাদের কাছে মুখ-ঢাকা রহস্যময় লোকজনের উদয় হয়। তারা বেদুইন। তারা কাফেলা-রুটের নজরদারি করে। তারা চোর, বর্বর গোত্র সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়। তারা আসে নীরবে, বিদায়ও নেয় একইভাবে। কালো কাপড়ে মোড়া থাকে তারা, দেখা যায় কেবল তাদের চোখ দুটি। এক রাতে এক উটচালক আগুনের কাছে এলো। সেখানেই ইংরেজ ভদ্রলোক ও ছেলেটা বসেছিল। 'গোত্রীয় যুদ্ধ লাগার গুজব আসছে,' উটচালক বলে তাদের।

তিনজন নীরব হয়ে গেল। ছেলেটা জানায়, বাতাসে ভয়ের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কিন্তু তাকে কিছু বলেনি। আবারো সে কথাহীন ভাষা বুঝতে পারল। একেই বলে 'সার্বজনীন ভাষা।'

ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, তারা বিপদগ্রস্ত কি-না।

'একবার আপনি মরুভূমিতে ঢুকে পড়েছেন তো আর ফিরে যাওয়ার রাস্তা পাবেন না,' উটচালক বলে। 'আর যেহেতু ফিরে যেতে পারছেন না, তাই চিন্তা একটিই। তা হলো এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো রাস্তা বের করা। বাকি সবকিছু আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। বিপদ-আপদও।'

আর সে রহস্যময় সেই শব্দ বলে কথা শেষ করে : '*মাকতুব*।'

'আপনাকে এখন কাফেলার প্রতি আরো মনোযোগ দিতে হবে,' উটচালক চলে যেতেই ছেলেটা বলে ইংরেজ ভদ্রলোককে। 'আমরা অনেক ঘুর পথে চলব, তবে সবসময় একই দিকে এগুতে থাকব।'

'আর তোমার দরকার দুনিয়া সম্পর্কে অনেক বেশি পড়া,' জবাব দেন ইংরেজ ভদ্রলোক। 'বইপত্র এ ব্যাপারে কাফেলার মতোই।'

মানুষজন আর পশুর বিশাল সমাবেশটি আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল। আর দিনগুলো সবসময়ই থাকে নীরব। তবে আগে রাতে আগুনের পাশে বসে লোকজন কথা বলত, এখন সেই স্থানও নীরব হয়ে গেছে। এরপর একদিন কাফেলার নেতা সিদ্ধান্ত জানালেন, এখন থেকে রাতে আগুন জ্বালানো যাবে না। কাফেলা যাতে কারো নজরে না পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা।

মুসাফিরেরা রাতে বৃত্তাকারভাবে পশুগুলোকে রাখার ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। তারা রাতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে একসাথে মাঝখানে ঘুমাত। আর কাফেলার সর্দার তাদের অবস্থানের প্রান্তগুলোতে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করলেন।

এক রাতে ঘুমাতে পারছিলেন না ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনি ছেলেটাকে ডাকলেন। তারা ক্যাম্পের আশপাশে বালিয়াড়ির মধ্যে হাঁটাহাঁটি করলেন। তখন পূর্ণিমা। ছেলেটা তার জীবনের কথা বলে ইংরেজ ভদ্রলোককে।

ছেলেটা ক্রিস্টালের দোকানে কাজ করতে গিয়ে যে অগ্রগতি হাসিল করেছে, তা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন।

'সবকিছু পরিচালনার মূলনীতি এটিই,' তিনি বললেন। 'আলকেমিতে আমরা একে বলি জগতের আত্মা। তুমি যখন মন-প্রাণ দিয়ে কোনো কিছু কামনা করো, সেটি তখনই হয়, যখন তুমি জগতের আত্মার সবচেয়ে কাছে থাকো। এটি সবসময় ইতিবাচক শক্তি।'

তিনি আরো বললেন, এটি স্রেফ কোনো মানব উপহার নয়। পৃথিবীর বুকে থাকা প্রতিটি জিনিসের আত্মা আছে। খনিজ, সব্জি কিংবা প্রাণী, এমনকি নিছক কোনো চিন্তাই হোক না কেন - সবারই আত্মা আছে।

'পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই সবসময় রূপান্তরিত হয়। কারণ পৃথিবী জীবন্ত... এবং এর আত্মা আছে। আমরা সেই আত্মার অংশবিশেষ। এ কারণে আমরা খুব কমই বুঝতে পারি, এটি আমাদের হয়ে কাজ করছে। সম্ভবত ক্রিস্টাল দোকানে বুঝতে পেরেছ, এমনকি কাচের সামগ্রীও তোমার সাফল্যের জন্য সহযোগিতা করেছে।'

ছেলেটা চাঁদ আর স্বচ্ছ বালুর দিকে তাকিয়ে বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। 'মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সময় আমি কাফেলাকে লক্ষ করেছি,' সে বলল। 'কাফেলা আর মরুভূমি একই ভাষায় কথা বলে। এই কারণে মরুভূমি অতিক্রম করার সুযোগ দেয় কাফেলাকে। সে কাফেলার প্রতিটি পদক্ষেপ পরীক্ষা করে। দেখে সে সময়মতো মরুদ্যানে যেতে পারবে কি-না।'

'আমাদের কেউ যদি ওই ভাষা না বুঝে কেবল ব্যক্তিগত সাহসের ওপর ভর করে এই কাফেলায় যোগ দেয়, তবে সফর আরো বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।'

তারা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল।

'আর ওটিই শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের জাদু,' ছেলেটা বলল। 'আমি দেখেছি, গাইডরা কিভাবে মরুভূমির ইঙ্গিত পড়ে, কিভাবে কাফেলার আত্মা মরুভূমির আত্মার সাথে কথা বলে।'

ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, 'আমি কাফেলার দিকে আরো বেশি নজর দেব।'

'আর আমি আপনার বই আরো ভালোভাবে পড়ব,' ছেলেটা বলল।

***

এগুলো অদ্ভুত সব বই। এসব বইয়ে পারদ, লবণ, ড্রাগন আর রাজা-বাদশাহদের কথা লেখা। এগুলোর কিছুই সে বুঝতে পারে না। তবে একটি আইডিয়া সব বইয়ে বারবার বলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সেটি হলো : সবকিছুই মাত্র একটি জিনিসেরই প্রকাশ।

একটি বইয়ে সে শিখেছে, আলকেমি সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠটি রয়েছে মাত্র কয়েকটি লাইনে। তা একটি পান্নার উপর লেখা।

'ওই হলো পান্নার ট্যাবলেট,' জানালেন ইংরেজ ভদ্রলোক। মনে হলো ছেলেটাকে কিছু শেখাতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করছেন।

'আচ্ছা, তাহলে আমাদের এতসব বইয়ের দরকার কেন?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'যাতে আমরা ওই কয়েকটি লাইন বুঝতে পারি,' ইংরেজ ভদ্রলোক জবাব দিলেন। তবে মনে হলো তিনি যা বললেন, তাতে নিজেরই বিশ্বাস নেই।

বিখ্যাত আলকেমিস্টদের কাহিনী থাকা বইটিই ছেলেটার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগল। এ লোকগুলো তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন গবেষণাগারে ধাতুকে পরিশোধন করার কাজে। তারা বিশ্বাস করতেন, কোনো ধাতুকে বছরের পর বছর উত্তপ্ত করা হলে সেটা থেকে অন্য সব উপাদান সরে যায়। এরপর বাকি যা থাকে তা হলো 'জগতের আত্মা'। 'জগতের আত্মা' তাদেরকে পৃথিবীর বুকে থাকা সবকিছু বোঝার সুযোগ দেয়। কারণ ঠিক এই ভাষাতেই সবকিছু তথ্য আদান-প্রদান করে। তারা এই আবিষ্কারকে বলেন 'সেরা সৃষ্টি'। এর কিছু অংশ তরল, কিছু অংশ শক্ত।

'আপনি কি ভাষাটি বোঝার জন্য কেবল মানুষ আর শুভ-অশুভ ইঙ্গিত লক্ষ করতে পারেন না?' ছেলেটা জানতে চাইল।

'তোমার মধ্যে সবকিছু সরলীকরণের বাতিক রয়েছে,' একটু রেগে জবাব দিলেন ইংরেজ ভদ্রলোক। 'আলকেমি একটা সিরিয়াস বিষয়। বিশেষজ্ঞরা যেভাবে করেছেন, প্রতিটি ধাপ ঠিক সেভাবেই করতে হয়।'

ছেলেটা শিখল 'সেরা সৃষ্টির' তরল অংশকে বলে 'আবে হায়াত'। এটি সব রোগ সারায়। এটিই আলকেমিস্টদের বুড়ো হওয়া থেকে বিরত রাখে। আর এর শক্ত অংশকে বলে 'পরশ পাথর'।

'পরশ পাথর পাওয়া সহজ কাজ নয়,' বললেন ইংরেজ ভদ্রলোক। 'আলকেমিস্টরা বছরের পর বছর তাদের গবেষণাগারে ব্যয় করেন, ধাতুকে শোধন করার সময় তারা আগুন লক্ষ করেন। তারা দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন আগুনের কাছে। এই আগুন ধীরে ধীরে দুনিয়ার অসার বস্তুরাজি নিষ্কাষণ করে। তারা আবিষ্কার করেছেন, ধাতুর শোধন তাদেরকেও পরিশোধিত করার ব্যবস্থা করে।'

ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর কথা মনে পড়ল ছেলেটার। তিনি বলেছিলেন, ছেলেটার জন্য ক্রিস্টাল সামগ্রী পরিষ্কার করা একটি ভালো কাজ, এতে করে সে খারাপ চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। ছেলেটা আরো ভালো করে বুঝতে পারল, যে কেউ নিজের দৈনন্দিন জীবন থেকেই আলকেমি শিখতে পারে।

'আর পরশ পাথর তো দুর্দান্ত একটি জিনিস। পাথরের একটি ছোট টুকরা বিপুল পরিমাণ ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে।'

এ কথা শুনে ছেলেটা আলকেমির ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠল। তার মনে হলো, একটু ধৈর্য ধরলে সে-ও সবকিছুকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারবে। সে অনেক লোকের জীবনী পড়েছে। ওইসব লোক এমন করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন হেলভিটিয়াস, ইলিয়াস, ফুলক্যানিলি ও জাবির। দারুণ সব কাহিনী। তাদের সবাই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন। তারা সফর করেছেন, জ্ঞানী লোকদের সাথে কথা বলেছেন, অবিশ্বাসীদের জন্য অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন, পরশ পাথর ও আবে হায়াতের মালিক ছিলেন।

তবে ছেলেটা যখন জানতে চাইল, কিভাবে 'সেরা সৃষ্টি' অর্জন করা যায়, তখন ভদ্রলোক পুরোপুরি বোকা বনে গেলেন। এগুলো স্রেফ ড্রয়িং, কোড করা নির্দেশনা, এবং দুর্বোধ্য কিছু রচনা।

***

'তারা কেন সবকিছু এত জটিল করলেন,' সে এক রাতে ইংরেজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটা লক্ষ করল ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠলেন, তিনি তার বইপত্রগুলো বুঝতে পারছেন না।

'যাতে যারা বোঝার ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কেবল তারা বুঝতে পারেন,' তিনি বললেন। 'ধরো, আমরা সবাই যদি লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করে ফেলি, তবে সোনার দাম কমে যাবে না?

'যাদের ধৈর্য আছে, যারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে চায়, কেবল তারাই যাতে সেরা সৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। ঠিক এ কারণেই আমি এই মরুভূমির মধ্যখানে আছি। আমি সত্যিকারের আলকেমিস্ট খুঁজছি। তিনি এসব কোডের অর্থ বের করতে আমাকে সাহায্য করবেন।'

‘এসব বই কখন লেখা হয়েছে?’ ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

‘কয়েক শ’ বছর আগে।’

‘ওইসব দিনে তো তাদের কাছে প্রিন্টিং প্রেস ছিল না,’ ছেলেটা যুক্তি দিলো। ‘আলকেমি সম্পর্কে কোনোভাবেই সবাই জানতে পারত না। তাহলে তারা কেন এত ড্রয়িং দিয়ে এমন অদ্ভুত ভাষায় লিখেছেন?’

ইংরেজ ভদ্রলোক তাকে সরাসরি জবাব দিলেন না। তিনি বললেন, গত কয়েক দিন তিনি নজর রেখেছিলেন, কিভাবে কাফেলা চলে। কিন্তু তিনি নতুন কিছুই শিখতে পারেননি। মাত্র একটি বিষয়ই লক্ষ করেছেন। তা হলো যুদ্ধের কথা আরো বেশি বেশি করে বলা হচ্ছে।

***

তারপর একদিন ছেলেটা বইগুলো ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে ফিরিয়ে দিলো। ‘তুমি কি কিছু শিখেছ?’ ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন। জবাব শোনার জন্য তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। যুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে চিন্তা এড়ানোর জন্য কারো সাথে কথা বলতে চাইছিলেন তিনি।

“আমি শিখেছি, জগতের একটি আত্মা আছে। যে-ই আত্মাটি বুঝতে পারবে, সে-ই সবকিছুর ভাষাও বুঝতে পারবে। আমি শিখেছি, অনেক আলকেমিস্ট তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন, ‘জগতের আত্মা,’ ‘পরশ পাথর,’ ও ‘আবে হায়াত’ আবিষ্কারের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

“তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমি শিখেছি, এসব জিনিস এত সহজ যে, এগুলো একটি পান্নার গায়েও লেখা যেতে পারে।”

ইংরেজ ভদ্রলোক খুবই হতাশ হলেন। বছরের পর বছর গবেষণা, জাদুকরি প্রতীক, অদ্ভুত বাক্যরাজি, গবেষণাগারের সরঞ্জাম... কিছুই ছেলেটাকে অভিভূত করতে পারেনি। তার আত্মা এসব জিনিস বোঝার মতো বিকশিত হয়নি, তিনি ভাবলেন।

তিনি তার বইপত্র ফিরিয়ে নিয়ে সেগুলো তার ব্যাগে আবার ভরে নিলেন।

‘চলে যাও, গিয়ে কাফেলা দেখো,’ তিনি বললেন। ‘ওই কাফেলা আমাকে কিছুই শেখাবে না।’

ছেলেটা ফিরে গেল গভীর মনোযোগে মরুভূমির নীরবতা লক্ষ করতে, পশুগুলোর তোলা বালি দেখতে। ‘প্রত্যেকেরই শেখার নিজস্ব পন্থা রয়েছে,’ সে মনে মনে বলল। ‘তার পথ আমার মতো নয়, কিংবা আমার পথও তার মতো নয়। তবে আমরা দু’জনই আমাদের নিয়তির অনুসন্ধানে নিয়োজিত। আর এ কারণে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।’

***

কাফেলা রাত-দিন চলতে শুরু করল। মুখ-বাঁধা বেদুইনরা এখন আগের চেয়ে ঘনঘন এসে নানা তথ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটার ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিল উটচালক। সে জানাল, গোত্রীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কাফেলা যদি মরুদ্যানে পৌঁছাতে পারে, তবে তা হবে ভাগ্যের ব্যাপার।

প্রাণীগুলোর দম শেষ হয়ে আসছিল। লোকজন কথা বলা আরো কমিয়ে দিয়েছে। রাতের সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল নীরবতা। তখন কেবল উটের গোঙানি শোনা যায়। আগে উটের গোঙানিকে কেউ পাত্তা দিত না। এখন ওই সামান্য শব্দেই সবাই ভয় পেয়ে যায়। আশঙ্কা জাগে, এ হয়তো আক্রমণের সঙ্কেত।

তবে সেই উটচালকের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে ভয়-ডর বলে কিছু আছে বলে মনে হলো না।

'আমি জীবিত আছি,' সে এক রাতে খেজুর চিবুতে চিবুতে বলল ছেলেটাকে। অন্ধকারে চারদিক ঢাকা, চাঁদ নেই, আগুনও নেই। 'আমি যখন খাই, তখন কেবল তা নিয়েই চিন্তা করি। যখন ছুটে চলি, তখন কেবল ছোটার দিকেই নজর থাকে আমার। আমাকে যখন যুদ্ধ করতে হয়, তখন তা হয় অন্য যেকোনো দিনে মরার মতোই ভালো দিন।

'যেহেতু আমি অতীতে বা ভবিষ্যতে বাঁচতে পারি না, আমি কেবল বর্তমান নিয়েই ভাবি। তুমি যদি বর্তমানের দিকে মনোযোগ দাও, তবে তুমি সুখী মানুষ হতে পারবে। তুমি দেখবে মরুভূমিতে জীবন আছে, দেখবে আকাশে আছে তারার মেলা, আর গোত্রগুলো যুদ্ধ করছে, কারণ তারা মানব জাতিরই অংশ। জীবন তোমার জন্য হয়ে যাবে একটি আনন্দ করার, মহা উৎসব করার জায়গা। কারণ আমাদের ঠিক বর্তমানের মুহূর্তটিতে বাস করার নামই জীবন।'

দুই রাত পর ঘুমানোর প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ছেলেটা অন্যসব রাতের মতোই আকাশে তারার দিকে তাকাল। সে দেখল, পূর্ব দিগন্ত অন্য দিনের চেয়ে অনেক নিচে, মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তার মনে হলো তারাগুলো মরুভূমির ঠিক উপরে অবস্থান করছে।

'ওটি তো মরুদ্যান,' উটচালক বলল।

'তাহলে এখনই আমরা যাচ্ছি না কেন?' ছেলেটা জানতে চাইল।

'কারণ এখন আমাদের ঘুমানোর সময়।'

***

সূর্য উঠার সময় ছেলেটার ঘুম ভাঙল। আগের রাতে তার সামনে যেখানে ছোট ছোট তারা আছে বলে হচ্ছিল, এখন সেখানে সীমাহীন খেজুর গাছ, পুরো মরুভূমিতে ছড়িয়ে আছে।

'আমরা পেরেছি!' বললেন ইংরেজ ভদ্রলোকটি। তিনিও খুব সকালে জেগেছেন।

তবে ছেলেটা তখন শান্ত। সে মরুভূমির নীরবতার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। সে কেবল গাছপালার দিকে তাকিয়েই পরিতৃপ্ত ছিল। পিরামিডে পৌঁছাতে তার এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। একদিন হয়তো এই সকাল তার কাছে স্রেফ একটি স্মৃতিতে পরিণত হবে। তবে এখন হলো বর্তমান মুহূর্ত। উটচালক একে বলেছিল উপভোগ করার সময়। অবশ্য সে তার অতীতের শিক্ষা ও ভবিষ্যত স্বপ্নের আলোকে নিজের মতো করে থাকতে চাইছে। যদিও একদিন খেজুর গাছ দর্শন নিছক একটি স্মৃতিতে পরিণত হবে, তবে ঠিক এই মুহূর্তে এটি ছায়া, পানি আর যুদ্ধ থেকে রক্ষার পাওয়ার ইঙ্গিতেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। গতকাল উটের গোঙানি ছিল বিপদের সঙ্কেত, এখন খেজুর গাছের সারি হতে পারে কোনো অলৌকিক ঘটনার সূচনা।

পৃথিবী অনেক ভাষায় কথা বলে, ছেলেটা ভাবল।

***

সময় খুব দ্রুত ছোটে, ঠিক যেভাবে চলে কাফেলা, ভাবছিলেন আলকেমিস্ট। তিনি মরুদ্যানে শত শত লোক আর পশুর আগমন দেখছিলেন। নবাগতদের আগমনে লোকজন চিৎকার করছে, ধুলায় মরুভূমির সূর্যকে আড়াল করে ফেলেছে, মরুদ্যানের শিশুরা অচেনাদের আগমনে উৎসাহে ফেটে পড়ছে। আলকেমিস্ট দেখলেন, গোত্রপতিরা কাফেলার নেতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, তার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলছেন।

কিন্তু এসবের কিছুই আলকেমিস্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। তিনি আগেও অনেক লোককে আসতে দেখেছেন, যেতে দেখেছেন। মরুভূমি আগের মতোই রয়ে গেছে। তিনি দেখেছেন, রাজা-বাদশাহ আর ফকিরের দল হেঁটে গেছে মরুভূমির বালির উপর দিয়ে। বাতাসে সবসময় বালিয়াড়ি বদলে যায়, কিন্তু তার পরও সেগুলো আগের মতো বালিই রয়ে যায়। তিনি ছোটবেলা থেকে ঠিক এমনই দেখে আসছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে হলুদ বালি আর নীল আকাশ দেখার পর মুসাফিররা যখন খেজুর গাছের সবুজ পাতা প্রথম দেখে, তখন আনন্দিত হয়। তিনি এই দৃশ্য সবসময় উপভোগ করেন। ঈশ্বর হয়তো মরুভূমি এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ খেজুর গাছের প্রশংসা করতে পারে, তিনি ভাবলেন।

তিনি বাস্তব বিষয়ে আরো মনোযোগী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন, কাফেলায় একজন আছেন। তাকে তার কাছ থেকে তার গোপনবিদ্যার কিছু অংশ শিখতে হবে। শুভ-অশুভ ইঙ্গিত তাকে এমনই বলেছে। তিনি এখনো লোকটিকে চেনেন না। তবে দেখা দেওয়ামাত্র তার প্রশিক্ষিত চোখ ঠিকই চিনে নেবে। তিনি আশা করছেন, তার আগের ছাত্র যেমন সক্ষম ছিল, এই লোকও তেমন হবে।

আমি জানি না, এসব জিনিস কেন মুখের কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে, তিনি ভাবলেন। এটি ঠিক এমন নয় যে এগুলো গোপন বিষয়। ঈশ্বর তার রহস্যগুলো তার সব সৃষ্টির কাছে সহজেই প্রকাশ করেন।

এই সত্যের ব্যাপারে তার কাছে একটি মাত্র ব্যাখ্যাই আছে। তা হলো : জিনিসগুলো এভাবে সঞ্চারিত হওয়া উচিত। কারণ এগুলো তৈরি হয়েছে বিশুদ্ধ জীবন থেকে। আর ছবি বা শব্দে এ ধরনের জীবন প্রকাশ করা যায় না।

লোকজন ছবি বা শব্দে মোহিত হয়ে পড়েছে বলেই 'জগতের ভাষাকে' বিস্মৃতির আড়লে ফেলে দিয়েছে।

***

মরুদ্যান নামে যা দেখল, তা বিশ্বাস করতে পারছিল না ছেলেটা। একবার ভূগোল বইয়ে ছবি দেখেছিল সে - মরুদ্যান হলো কয়েকটি খেজুর গাছে ঘেরা একটি কূপ। কিন্তু তার সামনে যে মরুদ্যানটি আছে, তা স্পেনের অনেক শহরের চেয়েও বড়। এখানে আছে তিন শ' কূপ, পঞ্চাশ হাজার খেজুর গাছ, পুরো এলাকাজুড়ে অগণিত রঙিন তাঁবু।

'*আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার* (হাজার রাত্রি এবং এক রাত্রি, আরব্য উপন্যাস) মতো,' ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন। তিনি তখন আলকেমিস্টের সাথে সাক্ষাতের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

তাদের ঘিরে ধরেছিল শিশুরা। তারা আগত পশু আর মানুষের দিকে তাকিয়েছিল উৎসুক্য দৃষ্টিতে। মরুদ্যানের পুরুষেরা জানতে চাইছিল, তারা কোনো যুদ্ধ দেখেছে কি-না। আর নারীরা কাড়াকাড়ি করছিল সওদাগরদের নিয়ে আসা কাপড় আর মূল্যবান রত্নপাথর নিয়ে। মরুভূমির নীরবতা এখানে সুদূরের স্বপ্ন; মুসাফিরেরা বিরামহীনভাবে কথা বলছিল, হাসছিল, চিৎকার করছিল। মনে হচ্ছিল, তারা কল্পনার জগত থেকে আবার বাস্তবের পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থায় ফিরে এসেছে। তারা ছিল স্বস্তিতে, আনন্দে।

মরুভূমিতে থাকার সময় তারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মরুদ্যানকে কেন সবসময় নিরপেক্ষ এলাকা বিবেচনা করা হয় - তা ছেলেটাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল উটচালক। কারণ এখানকার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারী আর শিশু। মরুভূমির সবখানে আছে মরুদ্যান। গোত্রগুলো যুদ্ধ করে মরুভূমিতে, তারা মরুদ্যানকে আশ্রয় নেওয়ার স্থান হিসেবে ব্যবহার করে।

কিছুটা কষ্ট করে কাফেলার সর্দার তাদের সবাইকে একত্রিত করে এখানে অবস্থান করার নিয়ম-কানুন বলে দিলেন। গোত্রীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। আর তারা যেহেতু মুসাফির, তাই তাদেরকে এখানে যারা বাস করে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে, তাদেরকে সর্বোত্তম

সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। মেহমানদারির রেওয়াজই এমন। তারপর তিনি তার প্রহরীসহ সবাইকে তাদের অস্ত্র গোত্রপতিদের নির্ধারিত লোকজনের কাছে জমা দিতে বললেন।

'এ হলো যুদ্ধের আইন,' কাফেলা সর্দার বললেন। 'মরুদ্যান কখনো সেনাবাহিনী বা সৈন্যদের আশ্রয়কেন্দ্র হতে পারে না।'

ছেলেটাকে বিস্মিত করে ইংরেজ ভদ্রলোক তার ব্যাগ থেকে ক্রোম-প্লেট করা রিভলভার বের করে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আসা লোকদের হাতে দিলেন।

'রিভলভার কেন,' সে জিজ্ঞাসা করল।

'এটি লোকজনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে আমাকে সাহায্য করে,' ইংরেজ ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

এর মধ্যেই ছেলেটা তার গুপ্তধন নিয়ে ভেবেছে। সে তার স্বপ্নের যত কাছে আসছে, কাজটি তত কঠিন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বুড়ো রাজা যেটিকে 'সূচনাকারীর ভাগ্য' বলেছিলেন, তা এখন আর কাজ করছে না। স্বপ্নের পিছু নিয়ে সে তার ধৈর্য আর সাহসের পরীক্ষা কেবল দিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু তাকে তাড়াহুড়া করলে চলবে না, অধৈর্য হলেও হবে না। সে যদি আবেগের চোটে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে, তবে হয়তো তার জন্য পথে ঈশ্বরের রেখে দেওয়া নিদর্শন আর ইঙ্গিত দেখতে পাবে না।

ঈশ্বর সেগুলো আমার পথজুড়ে রেখে দিয়েছেন। এই ভাবনায় সে নিজেই বিস্মিত হলো। এর আগে পর্যন্ত সে ইঙ্গিতগুলোতে মনে করত এই দুনিয়ার বিষয়বস্তু। খাওয়া-ঘুমানো কিংবা ভালোবাসা কামনা করা বা চাকরি খোঁজার মতো কোনো বিষয়। সে কখনো এগুলোকে তার করণীয় সম্পর্কে ঈশ্বরের ভাষায় রেখে যাওয়া ইঙ্গিত বলে চিন্তা করেনি।

'কখনো ধৈর্যহারা হবে না,' সে বারবার নিজেকেই সতর্ক করে দিলো। "বিষয়টি উটচালক এভাবে বলেছিল : 'খাওয়ার সময় খাবে। আর যখন চলার সময়, তখন চলবে।'"

প্রথম দিন একেবারে সবাই জম্মের মতো ঘুমিয়ে নিলো, ওই ইংরেজ ভদ্রলোক পর্যন্ত। ছেলেটার জন্য নির্ধারিত ছিল তার বন্ধু থেকে একটু দূরের জায়গা, তার সমবয়সী অন্য কয়েকটি ছেলের সাথে একটি তাঁবুতে। তারা মরুভূমির মানুষ। বড় বড় নগরী সম্পর্কে তার গল্প শুনতে অদম্য আগ্রহী।

ছেলেটা তার রাখাল জীবনের গল্প শোনাল তাদের। তারপর ক্রিস্টাল দোকানে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তাঁবুতে হাজির হলেন ইংরেজ ভদ্রলোক।

'আমি তোমাকে সেই সকাল থেকে খুঁজে মরছি,' বলতে বলতে তিনি ছেলেটাকে বাইরে নিয়ে এলেন। 'আলকেমিস্টের ঠিকানা খোঁজার জন্য তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

প্রথমে তারা কারো সাহায্য ছাড়াই তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। আলকেমিস্ট সম্ভবত এই মরুদ্যানের অন্য সব লোকজনের থেকে ভিন্নভাবে বাস করেন, তার তাঁবুতে হয়তো সবসময় আগুন জ্বলতে থাকে। তারা সবকিছু অনুসন্ধান করল। দেখতে পেল, মরুদ্যানটি তাদের কল্পনার চেয়েও অনেক বড়। এখানে শত শত তাঁবু আছে।

'আমরা একটি প্রায় পুরো দিন নষ্ট করলাম,' ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন। তারা তখন কাছের একটি কুয়োর সামনে বসতে যাচ্ছিলেন।

'কাউকে কি জিজ্ঞাসা করব?' ছেলেটা জানতে চাইল।

ইংরেজ ভদ্রলোক চাইছিলেন না, তার এই সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্য কেউ জানুক। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে উপায়ও নেই। রাজি হলেন। তবে যেহেতু ছেলেটা তার চেয়ে ভালো আরবি জানে, তাই তাকেই বললেন জিজ্ঞাসা করতে। ছেলেটা কুয়ো থেকে মশকে পানি ভরতে আসা এক নারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'সালাম, ম্যা'ম। আমি এই মরুদ্যানে আলকেমিস্ট কোথায় থাকেন, জানেন?'

ওই নারী বললেন, তিনি এমন কাউকে চেনেন না। তিনি তাড়াহুড়া করে ফিরে যেতে লাগলেন। তবে কেটে পড়ার আগে তিনি ছেলেটাকে উপদেশ দিয়ে গেলেন, সে যেন কালো পোশাক পরা কোনো নারীর সাথে কথা না বলে। কারণ কালো কাপড় পরা মানে বিবাহিতা। তার উচিত হবে ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখানো।

ইংরেজ ভদ্রলোক হতাশ হলেন। মনে হলো, দীর্ঘ সফর শেষে কিছুই প্রাপ্তি ঘটল না। ছেলেটাও দুঃখ পেল। তার বন্ধু তার নিয়তির দিকে ছুটছেন। আর কেউ যখন এ ধরনের কাজে নামে, তখন পুরো মহাবিশ্ব তাকে সফল করার জন্য একযোগে সাহায্য করার চেষ্টা করে, বুড়ো রাজা এমনই বলেছিলেন। তার কথা তো ভুল হতে পারে না।

'আমি এর আগে কখনো আলকেমিস্টদের কথা শুনিনি,' ছেলেটা বলল। 'হয়তো এখানে কেউ নেই-ই।'

ইংরেজ ভদ্রলোকের চোখ দুটি জ্বলে ওঠল। 'কথা কী তাহলে এই! হয়তো এখানকার কেউ আলকেমিস্ট কী, তা-ই জানে না! জিজ্ঞাসা করে দেখো তো, লোকজনের রোগবালাই সারায় কে!'

এরপর আরো কয়েক নারী এলো পানি নিতে। কিন্তু তাদের সবার পরনে ছিল কালো পোশাক। তা-ই ইংরেজ ভদ্রলোক চাপাচাপি করলেও ছেলেটা তাদের কাউকেই জিজ্ঞাসা করল না। তারপর দেখা গেল এক লোককে। ছেলেটা এবার তাকে একটু ভিন্নভাবে জিজ্ঞাসা করল : 'রোগ-বালাই সারায়, এমন কাউকে আপনি চেনেন?'

'আল্লাহই সব রোগ সারায়,' লোকটির সোজাসাপ্টা জবাব। আগন্তুকদের তিনি বেশ ভয় পাচ্ছিলেন। 'আপনারা হয়তো গুণিনের খোঁজ করছেন।' লোকটি পবিত্র কোরআন থেকে কিছু আয়াত তেলায়াত করলেন। তারপর চলে গেলেন।

আরেকজন এলেন। তিনি ছিলেন আরো বয়স্ক, সাথে ছোট বালতি। ছেলেটা ওই প্রশ্নই আবার করল।

'তোমরা কেন এমন ধরনের লোক খোঁজ করছ?' তিনি জানতে চাইলেন।

'কারণ আমার বন্ধু এমন কারো সাথে দেখা করার জন্য কয়েক মাস ধরে সফর করেছেন,' ছেলেটা বলল।

'এই মরুদ্যানে এ ধরনের কেউ থাকলে, তিনি অবশ্যই খুবই শক্তিমান কেউ হবেন,' বুড়ো লোকটি একটু ভেবে বললেন। 'কেউই, এমনকি গোত্রপতিরাও ইচ্ছা করলেই তার সাথে দেখা করতে পারেন না। তিনি চাইলেই কেবল পারা সম্ভব।

'যুদ্ধ থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর কাফেলা চলে যাক। মরুদ্যানের জীবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করো না,' তিনি বললেন। তারপর হেঁটে চলে গেলেন।

তবে ইংরেজ ভদ্রলোকটি খুশি হলেন। তিনি ঠিক পথেই চলেছেন।

সবশেষে অল্প বয়স্কা এক নারী এলো সেখানে। তার পোশাক কালো ছিল না। তার কাঁধে ছিল একটি সুরাহি। হিজাব পরা, তবে মুখ খোলা। ছেলেটা তার দিকে এগিয়ে গেল আলকেমিস্ট সম্পর্কে জানতে।

ওই মুহূর্তে মনে হলো সময় থমকে গেছে, 'জগতের আত্মা' তার মধ্যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। সে মেয়েটার কালো চোখের দিকে তাকাল, দেখল তার ঠোঁট হাসি আর নির্বাক ভাবের মাঝামাঝি অবস্থায়। পৃথিবীর সবাই যে ভাষায় কথা বলে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি শিখেছিল ছেলেটা। এ এমন ভাষা, যা দিয়ে পৃথিবীর সবাই তাদের হৃদয় বুঝতে পারে। এরই নাম ভালোবাসা। এর বয়স মানুষের চেয়ে বেশি, মরুভূমির চেয়েও প্রাচীন। দুই জোড়া আঁখি যখন মিলিত হয়, তখন সম্ভবত এ শক্তিরই প্রকাশ ঘটে, ঠিক যেমন এখানে কুয়োর কাছে ঘটছে। মেয়েটা হাসল। নিশ্চয় এটি শুভ লক্ষণ। এর অপেক্ষাতেই ছিল ছেলেটা। যদিও জীবনে কখনো সে তা বুঝতেই পারেনি। এই লক্ষণই সে কামনা করেছিল তার ভেড়ার পালে, বইতে, ক্রিস্টালের মধ্যে, মরুভূমির নীরবতায়।

এটা জগতের বিশুদ্ধতম ভাষা। এর জন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার হয় না, ঠিক যেমন সীমাহীন সময় পাড়ি দিতে মহাবিশ্বের কারো প্রয়োজন হয় না। ওই মুহূর্তে ছেলেটা বুঝল, সে তার জীবনের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত নারীর সামনে উপস্থিত। আর কোনো কথা বিনিময় ছাড়াই নারীটিও একই জিনিস বুঝল। দুনিয়ার অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে ছেলেটা এ ব্যাপারে অনেক বেশি নিশ্চিত। তাকে তার মা-বাবা আর দাদা-দাদি বলেছিলেন, সে অবশ্যই কারো প্রেমে পড়বে, কবুল বলার আগে সে সত্যিই কাউকে জানবে। তবে এভাবে যারা বোঝে, তারা সম্ভবত

সার্বজনীন ভাষা শেখেনি। কারণ কেউ ওই ভাষা জানলে সে বুঝতে পারবে, দুনিয়ায় কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা তুমি মরুভূমির মাঝখানেই থাকো কিংবা কোনো বড় শহরেই বাস করো। আর যখন এ ধরনের দুজন পরস্পরের সামনে আসে, তাদের চোখ দুটি অন্য দুটি চোখে হারিয়ে যায়, তখন অতীত আর ভবিষ্যত হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। কেবল থাকে ওই মুহূর্তই। এবং অবিশ্বাস্য নিশ্চয়তায় সূর্যের নিচে থাকা সবকিছু মাত্র একটি হাতেই লেখা হয়। ওই হাতই ভালোবাসা জাগিয়ে দেয়, দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জোড়া আত্মা তৈরি করে। এ ধরনের ভালোবাসা ছাড়া কারো স্বপ্নেরই কোনো মানে হয় না।

মাকতুব, ছেলেটা ভাবল।

ইংরেজ ভদ্রলোক ছেলেটাকে নাড়া দিয়ে বললেন, 'কী হলো, তাকে জিজ্ঞাসা করো!'

ছেলেটা তখন মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটা হাসল, ছেলেটাও ঠিক তা-ই করল।

'তোমার নাম কী?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'ফাতিমা,' মেয়েটা জবাব দিলো, চোখ দুটি নামিয়ে।

'আমার দেশেও অনেক মেয়েকে এই নামে ডাকা হয়।'

'আমাদের নবীর মেয়ের নামও এই,' ফাতিমা বলল। 'আমাদের সেনাবাহিনী দুনিয়ার সব জায়গায় এই নাম নিয়ে গেছে,' সুন্দরী মেয়েটা গর্বের সাথে বলল।

ইংরেজ ভদ্রলোক আবার তাগাদা দিলেন লোকজনের রোগ সারায় এমন কারো কথা সে জানে কি-না।

'ওই লোক তো দুনিয়ার সব রহস্য জানেন,' মেয়েটা বলল। 'তিনি মরুভূমিতে জিনদের সাথে কথা বলেন।'

জিনেরা হলো ভালো আর খারাপ আত্মা। মেয়েটা তখন দক্ষিণের দিক দেখাল। সেখানেই অদ্ভুত লোকটি থাকেন। তারপর সে সোরাহি ভরে চলে গেল।

ইংরেজ ভদ্রলোকটিও হাওয়া হয়ে গেলেন, আলকেমিস্টকে খুঁজতে। ছেলেটা কিন্তু আরো অনেকক্ষণ বসে রইল কুয়োর কাছেই। তার মনে পড়ল, তারিফায় একদিন ভূমধ্যসাগরের বাতাস তার কাছে এই নারীর সুগন্ধ বয়ে এনেছিল। সে বুঝতে পারল, এই নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার আগে থেকেই সে তাকে ভালোবাসত। সে উপলব্ধি করল, এই মেয়ের জন্য তার ভালোবাসাই তাকে পৃথিবীর সব গুপ্তধন আবিষ্কারে সক্ষম করে তুলবে।

পর দিন আবার সে গেল ওই কুয়োর কাছে, আশা ছিল মেয়েটাকে দেখবে। সে আশ্চর্য হলো সেখানে ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখে। তিনি মরুভূমির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

'আমি তার জন্য সারাটি বিকেল আর সন্ধ্যা অপেক্ষায় থেকেছি,' ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন। 'তিনি এলেন রাতের প্রথম প্রহরের পর। কী চাই তাকে বললাম। আর তিনি জানতে চাইলেন, আমি কখনো লোহাকে সোনা বানিয়েছি কি-না। আমি বললাম, তা শেখার জন্যই এখানে এসেছি।'

তিনি আমাকে বললেন, "তোমার উচিত লেগে থাকা, তিনি কেবল এটুকুই বললেন : 'চেষ্টা করে যাও।'"

ছেলেটা কিছু বলল না। হতভাগা ইংরেজ ভদ্রলোক। কত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন নতুন কিছু জানার জন্য। অথচ তাকে কিনা বলা হলো, তিনি এত দিন ধরে যা করে আসছিলেন, তা-ই যেন বারবার করতে থাকেন।

'তাহলে চেষ্টা চালিয়ে যান,' ছেলেটা বলল ইংরেজ ভদ্রলোককে।

'আমি তো সেটিই করতে যাচ্ছি। আমি এখন শুরু করছি।'

ইংরেজ ভদ্রলোক চলে যাওয়া মাত্র ফাতিমা এলো, সোরাহি ভরল পানিতে।

'আমি এসেছি তোমাকে মাত্র একটি কথা বলতে,' ছেলেটা বলল। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

মেয়েটা সোরাহি ফেলে দিলো, পানি গড়িয়ে পড়ল।

'আমি তোমার জন্য প্রতিটি দিন এখানে অপেক্ষা করব। আমি পিরামিডের কাছে থাকা গুপ্তধন খুঁজতে মরুভূমি পাড়ি দিয়েছি। যুদ্ধকে মনে হয়েছিল অভিশাপ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধ তো আমার জন্য রহমত। কারণ এ যুদ্ধই তোমার কাছে এনে দিয়েছে আমাকে।'

'যুদ্ধ একদিন শেষ হবে,' মেয়েটা বলল।

ছেলেটা চারপাশের খেজুর গাছগুলোর দিকে তাকাল। তার রাখাল আমলের কথা মনে পড়ল। আবারো সে রাখাল হতে পারে। গুপ্তধনের চেয়ে ফাতিমা তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

'গোত্রের লোকজন সবসময় গুপ্তধনের খোঁজ করে,' মেয়েটা বলল। মনে হলো সে বুঝতে পেরেছে ছেলেটা কী চিন্তা করছে। 'আর মরুভূমির নারীরা তাদের গোত্রের পুরুষদের জন্য গর্বিত।'

ফাতিমা তার সোরাহি আবার ভরে চলে গেল।

এরপর থেকে প্রতিদিন ছেলেটা কুয়োর কাছে গিয়ে ফাতিমার অপেক্ষায় থাকে। সে তার রাখাল জীবনের কাহিনী শোনায়, রাজার কথা জানায়, ক্রিস্টাল দোকানের গল্প বলে। তারা বন্ধু হয়ে যায়। মেয়েটার সাথে তার ১৫ মিনিটের সময়টুকু ছাড়া একটি দিনও তার কাটতে চায় না। এক দিন কাফেলার সর্দার তার কাফেলার সবাইকে এক সভায় ডাকলেন। তখন মরূদ্যানে আসার প্রায় এক মাস হয়ে গেছে।

'আমরা জানি না, কখন যুদ্ধ শেষ হবে। তাই আমরা আমাদের সফর অব্যাহত রাখতে পারছি না,' তিনি বললেন। 'যুদ্ধ আরো দীর্ঘ সময় লাগতে পারে, হয়তো

কয়েক বছরও থাকতে পারে।' তিনি বললেন, 'উভয় পক্ষেই শক্তিশালী বাহিনী আছে। যুদ্ধটা উভয় বাহিনীর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর যুদ্ধ নয়। এটি ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য লড়াইরত শক্তিগুলোর মধ্যকার যুদ্ধ। আর এ ধরনের যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন অন্য সব যুদ্ধের চেয়ে বেশি সময় লাগে। কারণ আল্লাহ তখন উভয় পক্ষের মধ্যে থাকেন।'

লোকজন তাদের থাকার জায়গায় ফিরে গেল, ছেলেটা ওই বিকেলে গেল ফাতিমার সাথে দেখা করতে। সে তাকে সকালের বৈঠকের কথা বলল। 'আমাদের দেখা হওয়ার দিনটিতে,' ফাতিমা বলল, 'তুমি আমাকে বলেছিলে, তুমি আমাকে ভালোবাসো। তারপর তুমি আমাকে সার্বজনীন ভাষা আর জগতের আত্মার কথা শিখিয়েছিলে। ওই কারণেই আমি তোমার অংশে পরিণত হয়েছি।'

ছেলেটা তার গলার আওয়াজ শুনল, মনে হলো, খেজুর গাছে বাতাসের আওয়াজের চেয়েও এই শব্দ অনেক সুন্দর।

'আমি এই মরুদ্যানে অনেক সময় ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি আমার অতীত, আমার ঐতিহ্য, মরুভূমির পুরুষেরা নারীদের কাছ থেকে যে ধরনের আচরণ আশা করে - সবই ভুলে গেছি। একেবারে ছোটকাল থেকেই আমি স্বপ্ন দেখছি, মরুভূমি আমার জন্য চমৎকার এক উপহার আনবে। এখন আমার উপহার এসে পড়েছে। আর তা হলো তুমি।'

ছেলেটা তার হাত ধরতে চাইল। কিন্তু ফাতিমার দুই হাত তার জগের হাতল ধরে থাকল।

'তুমি আমাকে বলেছ তোমার স্বপ্নের কথা। বুড়ো রাজার কথা বলেছ, গুপ্তধনের কথা আমাকে জানিয়েছ। শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের কথাও শুনিয়েছ। আর তাই আমি এখন কিছুই ভয় করি না। কারণ ওইসব ইঙ্গিতই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। আর আমি তোমার স্বপ্নের অংশ, তোমার নিয়তির অংশ, তুমি এমন কথাই বলেছ।

'আর এ কারণেই আমি চাই, তুমি তোমার স্বপ্নের দিকে ছুটতে থাকো। তোমাকে যদি যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে অপেক্ষা করো। তবে তোমাকে যদি এর আগেই যেতে হয়, তবে তোমার স্বপ্নের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। বাতাসে বালিয়াড়ি বদলে যায়, কিন্তু মরুভূমি কখনো বদলায় না। আর আমাদের একে অপরের ভালোবাসার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।'

'*মাকতুব*,' মেয়েটা বলল। 'আমি সত্যিই তোমার স্বপ্নে থেকে থাকলে, তুমি একদিন ফিরে আসবে।'

ওই দিন বিদায় নেওয়ার আগে ছেলেটা মনে কষ্ট পেল। তার জানা বিবাহিত রাখালদের কথা তার মনে পড়ল। দূরের মাঠে যাওয়ার বিষয়টি স্ত্রীদের বোঝানো তাদের জন্য কঠিন হতো। তারা যাদের ভালোবাসে, তাদের সাথে থাকার জন্য ভালোবাসার দরকার পড়ে।

পরের সাক্ষাতে সে ফাতিমাকে সে কথা বলল।

'মরুভূমি আমাদের কাছ থেকে আমাদের পুরুষদের নিয়ে যায়। তারা সবসময় ফেরে না,' মেয়েটা বলল। 'আমরা জানি, আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যারা ফেরে না, তারা মেঘের অংশ হয়ে যায়, পৃথিবী থেকে নেমে আসা নদী আর পানিতে থাকা প্রাণীর অংশ হয়ে থাকে। তারা সবকিছুর অংশ হয়ে যায়... জগতের আত্মায় পরিণত হয়।

'কেউ কেউ ফিরে আসে। তাতে অন্য নারীরাও খুশি হয়, কারণ তখন তারা বিশ্বাস করে, তাদের পুরুষেরাও একদিন হয়তো ফিরে আসবে। তারা ওইসব নারীর দিকে তাকায়, তাদের খুশিতে তাদের হিংসা হয়। এখন আমিও অপেক্ষায় থাকা নারীদের একজন হবো।

'আমি মরুভূমির নারী। আমি এজন্য গর্বিত। আমি চাই, যে বাতাস বালিয়াড়ির আকার গড়ে দিতে থাকে, সেই বাতাসের মতো স্বাধীনভাবে আমার স্বামী বালিয়াড়িতে ছুটতে থাকুক। আর দরকার হলে আমি এই বাস্তবতাও মেনে নেবো, সে মেঘের অংশে, প্রাণী আর মরুভূমির পানিতে পরিণত হয়েছে।'

ইংরেজ ভদ্রলোকের সন্ধানে গেল ছেলেটা। সে তার কাছে ফাতিমার কথা বলতে চাইল। সে দেখে বিস্মিত হলো, ইংরেজ ভদ্রলোক তার তাঁবুর বাইরে একটি বিশাল চুলা তৈরি করে নিয়েছেন। বড়ই অদ্ভুত চুলা। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছেন কাঠ। আর সবার উপরে আছে একটি স্বচ্ছ ফ্লাক্স। সেটি গরম হচ্ছে। ইংরেজ ভদ্রলোক মরুভূমির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তার চোখ দুটি বই পড়ার সময়ের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিল।

'এ হলো কাজের প্রথম ধাপ,' তিনি বললেন। 'আমাকে সালফার আলাদা করতে হবে। এ কাজ সফলভাবে করার জন্য আমাকে ব্যর্থতার ভয় পেলে চলবে না। ব্যর্থতার ভয়ই আমাকে সেরা সৃষ্টি পাওয়ার চেষ্টা চালানো থেকে বিরত রেখেছিল। এখন আমি সেই কাজ শুরু করেছি। এ কাজ ১০ বছর আগে শুরু করতে পারতাম। তবে আমি এই ভেবে খুশি যে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়নি।'

তিনি আগুনে কাঠ দিতেই থাকলেন। সূর্য ডুবে মরুভূমি গোলাপি হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল ছেলেটা। নিজের মধ্যে মরুভূমিতে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করল। হয়তো মরুভূমির নীরবতার মধ্যে তার প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে।

সে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল, মরুদ্যানের খেজুর গাছগুলোকে নজরের মধ্যে রেখে। বাতাসের শব্দ শুনল, তার পায়ের নিচে থাকা পাথরগুলো অনুভব করল। এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা ঝিনুকের খোলা দেখল। বুঝতে পারল, দূর অতীতে মরুভূমি ছিল একটি সমুদ্র। একটি পাথরে বসল, নিজেকে দিগন্তের সম্মোহনীতে পরিণত হতে দিলো। চেষ্টা করল ভালোবাসার ধারণাটাকে হাতের মুঠো থেকে দূরের জিনিস হিসেবে কল্পনা করতে, কিন্তু আলাদা করতে পারল না। তবে ফাতিমা মরুভূমির মেয়ে। তা-ই তাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে কেবল মরুভূমি।

চিন্তা করার সময় সে আকাশে কিছুর নাড়াচাড়া টের পেল। আকাশে তাকিয়ে বেশ উঁচুতে দুটি বাজপাখি উড়তে দেখল।

পাখি দুটিকে সে বাতাসে গোত্তা খেতে দেখল। তাদের ওড়া বিশেষ কোনো ভঙ্গিমায় না হলেও ছেলেটার মধ্যে বিশেষ অনুভূতি দানা বাঁধল। এর কী অর্থ হতে পারে ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে পাখি দুটির উড়াউড়ি লক্ষ করতে লাগল। চেষ্টা করতে থাকল তাদের ভঙ্গিমা বুঝতে। হয়তো মরুভূমির পাখি দুটি তাকে মালিকানাবিহীন ভালোবাসার অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করছে।

তার ঘুম ঘুম লাগল। মনে-প্রাণে সে জেগে থাকার চেষ্টা করল। আবার তার ঘুমানোর ইচ্ছাও করছিল। 'আমি পৃথিবীর ভাষা শিখছি, আর পৃথিবীর সবকিছু আমার কাছে অর্থ হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করেছে... এমনকি বাজপাখিদের উড়াউড়িও,' নিজেকে বলল। আর ওই ভাবনায় সে ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো। যখন তুমি ভালোবাসায় থাকবে, তখন সবকিছু আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করবে, ভাবল।

হঠাৎই একটি বাজ আকাশে দুরন্ত ঝাঁপ দিয়ে আরেকটিকে আক্রমণ করে বসল। বাজের এ ভঙ্গিমায় হঠাৎ করেই একটি ছবি ছেলেটার সামনে ভেসে ওঠল : একটি সেনাবাহিনী, খোলা তরবারি নিয়ে মরুদ্যানে হামলা করতে আসছে। সাথে সাথে দৃশ্যটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে ছবিটি তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। সে লোকজনের কাছে জিন-ভূতের কথা শুনেছে। সে নিজেও কিছু দেখে ফেলল : এগুলো হলো আকাঙ্ক্ষা যা তীব্রতার কারণে মরুভূমির বালিতে বাস্তবে রূপ পেয়েছে। কিন্তু মরুদ্যানে কোনো সেনাবাহিনী হামলা চালাক, এমন কোনো ইচ্ছা পতা সে নিশ্চয় পোষণ করেনি।

সে দৃশ্যটি ভুলে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হতে চাইল। সে আবারো চেষ্টা করল মরুভূমির গোলাপি ছায়া আর এর পাথরগুলোর দিকে মনোসংযোগ করতে। কিন্তু তার মনের মধ্যে এমন কিছু ঘটছিল, যার ফলে সে ধ্যানে মন বসাতে পারছিল না।

'সবসময় শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের দিকে নজর দেবে,' বুড়ো রাজা বলেছিলেন। আকাশের দৃশ্যটির কথা মনে পড়ল ছেলেটার। তার মনে হলো, সত্যি সত্যি ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে।

সে উঠে দাঁড়াল, খেজুর গাছগুলোর দিকে ফিরে যেতে থাকল। আবারো সে তার সামনে থাকা নানা জিনিসের অনেক ভাষা বুঝতে পারল : এবার মরুভূমি নিরাপদ, কিন্তু মরুদ্যানই বিপজ্জনক হয়ে ওঠেছে।

উটচালক একটি খেজুর গাছের নিচে বসেছিল। সে তখন সূর্যাস্ত দেখছিল। সে দেখল, ছেলেটা বালিয়াড়ির ওপার থেকে উদয় হলো।

'একটি সেনাবাহিনী আসছে,' ছেলেটা বলল। 'আমি ধ্যানের মধ্যে দেখেছি।'

'মরুভূমি মানুষের হৃদয় ধ্যানে ভরে রাখে,' উটচালক জবাব দিলো।

ছেলেটা তাকে বাজপাখি দুটি সম্পর্কে বলল : সে তাদের উড়াউড়ি দেখছিল, তারপর হঠাৎ তার মনে হলো যে সে জগতের আত্মার মধ্যে ডুবে গেছে।

ছেলেটা যা বলতে চাইছিল, উটচালক তা বুঝল। সে জানত, দুনিয়ার বুকে যেকোনো প্রদত্ত জিনিসই সবকিছুর ইতিহাস প্রকাশ করতে পারে। কেউ একজন যেকোনো বইয়ের যেকোনো একটি পাতা উল্টাতে পারে, কারো হাত দেখতে পারে; একটি কার্ড উল্টাতে পারে, কিংবা পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে পারে... যা-ই দেখুক না কেন, সে ওই মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সাথে নিজের সংযোগ স্থাপন করতে পারে। সত্যি সত্যিই ওইসব জিনিস নিজেরা কোনো কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, বরং কেবল যারা তাদের চারপাশের ঘটনা দেখছে, তারাই জগতের আত্মার মধ্যে ঢুকে অর্থ খুঁজে নিতে পারে।

মরুভূমি এমন লোকজনে পরিপূর্ণ, যারা জগতের আত্মায় ঢুকে অনায়াসে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে। তারা জ্যোতিষী হিসেবে পরিচিত। নারী ও প্রবীণেরা তাদের ভয় পায়। গোত্রের লোকজনও তাদের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকে। কারণ কেউ যদি জেনে যায়, তার ভাগ্যে মৃত্যু লেখা আছে, তবে তাকে দিয়ে কোনোভাবেই যুদ্ধ করানো সম্ভব নয়।

গোত্রের লোকজন যুদ্ধের স্বাদকেই অগ্রাধিকার দেয়। কী হবে, তা না জানার রোমাঞ্চ উপভোগ করে। ভবিষ্যত তো আল্লাহ আগেই লিখে রেখেছেন। আর যা লেখা আছে, তা তো মানুষের জন্য কল্যাণকরই। আর এ জন্যই গোত্রীয় লোকজন কেবল বর্তমানেই বেঁচে থাকে। কারণ বর্তমান হলো বিস্ময়ে পরিপূর্ণ, তাদের অনেক কিছু সম্পর্কে অবগত থাকতে হয় : শত্রুর তরবারি কোথায়? তার ঘোড়া কোথায়? জীবিত থাকতে হলে বুঝতে হবে, তরবারির পরের আঘাতটি কেমন হতে পারে। উটচালক যোদ্ধা নয়। সে জ্যোতিষীদের সাথে পরামর্শ করে। তাদের অনেকে যা বলে তা ঠিক হয়, অনেকের ভবিষ্যদ্বাণী হয় ভুল। তারপর একদিন সবচেয়ে বয়স্ক যে জ্যোতিষী তার কাছে সে গিয়েছিল (তাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করত)। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উটচালক কেন ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

'কারণ... যাতে আমি কিছু করতে পারি,' সে জবাব দিয়েছিল। 'কী ঘটতে পারে, তা জানতে পারলে আমি ওগুলো ঘটতে দিতে চাইব না।'

'কিন্তু তা হলে তো ওসব তোমার ভবিষ্যতের অংশ হবে না,' জ্যোতিষী বলেছিলেন।

'ঠিক আছে, আমি ভবিষ্যত জানতে পারলে, অন্তত নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করতে পারব।'

'যদি ভালো কিছু আসতে থাকে, তা হবে আনন্দদায়ক বিস্ময়,' জ্যোতিষী বলেছিলেন।

'আর খারাপ কিছু হলে এবং তা যদি তুমি আগেই জেনে যাও, তবে তুমি ওই ঘটনা ঘটার আগে থেকেই ভয়াবহ যন্ত্রণায় ভুগতে থাকবে।'

'আমি ভবিষ্যত জানতে চাই, কারণ আমি মানুষ,' উটচালক বলেছিল জ্যোতিষীকে। 'আর মানুষ সবসময় ভবিষ্যত নিয়েই বাস করে।'

জ্যোতিষী ছিলেন গুটি চালের ওস্তাদ। তিনি মাটিতে ছুঁড়ে সেগুলোর পতনের দিকে চেয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। ওই দিন তিনি কিছুই ছুঁড়লেন না। তিনি গুটিগুলো কাপড়ে বেঁধে তার ব্যাগে ভরে রাখলেন।

'আমি লোকজনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আগাম তথ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি,' তিনি বললেন। 'আমি গুটি চালের বিজ্ঞান জানি, আমি জানি কিভাবে সেগুলো ওই জায়গায় ঢোকানো যায়, যেখানে সবকিছু লেখা রয়েছে। সেখানে আমি অতীত পাঠ করি, ইতোমধ্যেই বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়া বিষয়গুলো আবিষ্কার করি, বর্তমানে এখানে উপস্থিত ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারি।

'যখন লোকজন আমার সাথে পরামর্শ করে, তা এজন্য নয় যে আমি ভবিষ্যত পড়তে পারি; আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করতে পারি বলে। ভবিষ্যত তো আল্লাহর হাতে। বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে একমাত্র তিনিই তা প্রকাশ করেন। আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করি কিভাবে? বর্তমানের ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে। তুমি যদি বর্তমানের দিকে নজর দাও, তুমিও এ ব্যাপারে উন্নতি করতে পারবে। আর বর্তমানের ব্যাপারে উন্নতি করতে পারলে ভবিষ্যতে যা আসবে তা হবে আরো ভালো। ভবিষ্যত ভুলে যাও। ঈশ্বর তার সন্তানদের ভালোবাসেন, এই আস্থা, এই শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি দিন বাঁচো। প্রতিটি দিনই সাথে করে বয়ে আনে চিরন্তনকে।

উটচালক জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন পরিস্থিতিতে কেন ঈশ্বর তাকে ভবিষ্যত দেখার সুযোগ দেন।

'কখন করবেন তা কেবল তিনিই তা জানেন। আর ঈশ্বর খুব কমই ভবিষ্যত প্রকাশ করেন। তবে তিনি তা কেবল একটি কারণেই করেন : এটি এমন ভবিষ্যত, যা বদলানোর জন্য লেখা হয়েছে।'

ঈশ্বর ছেলেটাকে ভবিষ্যতের একটি অংশ দেখিয়েছেন, উটচালক ভাবল। তিনি কেন এ ছেলেকেই তার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেন?

'যাও, গোত্রপতিদের কাছে গিয়ে সব বলো,' উটচালক বলল। 'তাদেরকে গিয়ে বলো, সেনাবাহিনী ধেয়ে আসছে।'

'তারা আমার কথায় হাসবেন।'

'তারা মরুভূমির মানুষ। আর মরুভূমির মানুষ শুভ-অশুভ ইঙ্গিত দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত।'

'তাহলে তো তারা সম্ভবত এর মধ্যেই জেনে গেছেন।'

'তারা ঠিক এখন ওই ব্যাপার সম্পর্কে অবগত নন। তারা বিশ্বাস করেন, যদি তাদের কিছু জানানোর দরকার পড়ে, তবে আল্লাহ তাদেরকে জানাবেন। আর তাদেরকে কিছু জানানোর দরকার হলে, তিনি সে ব্যাপারে কাউকে না কাউকে বলবেন। আগেও এমন অনেকবার ঘটেছে। তবে এবার ওই মানুষ হলে তুমি।'

ছেলেটা ভাবল ফাতিমার কথা। আর সে সিদ্ধান্ত নিলো, সে গোত্রপ্রধানদের সাথে দেখা করতে যাবে।

***

ছেলেটা মরুদ্যানের মাঝখানে থাকা বিশাল সাদা তাঁবুর সামনে পাহারাদারের সামনে এলো।

'আমি গোত্রপতিদের সাথে দেখা করতে চাই। মরুভূমি থেকে সঙ্কেত বয়ে এসেছি।'

জবাব না দিয়ে পাহারাদার তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল। সে অপেক্ষা করতে থাকল। কিছু সময় পর পাহারাদার বের হয়ে এলো, সাথে এক তরুণ আরব, সোনার কারুকাজের সাদা পোশাক পরা। যা দেখেছে তা আগত তরুণকে বলল ছেলেটা। তরুণটি তাকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত্রি নামল। যোদ্ধা ও সওদাগরদের নানা ধরনের লোকজন তাঁবুর ভেতরে ঢুকছিল, তাঁবু উদ্দীপ্ত করছিল। সময় গড়াতে লাগল। একসময় মরুদ্যানের আগুনের কুণ্ডলীগুলো একে একে নিভে মরুভূমির মতো শান্ত হয়ে পড়তে লাগল। কেবল ওই বিশাল তাঁবুর আলো জ্বলে রইল। এ পুরো সময়ে ছেলেটা কেবল ফাতিমার কথা ভাবল। সে এখনো মেয়েটার সাথে তার শেষ কথাবার্তার মর্ম বুঝতে পারছে না।

অবশেষে কয়েক ঘণ্টার প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। পাহারাদার ছেলেটাকে ভেতরে ঢোকার ইশারা করল। ভেতরে ঢুকে ছেলেটা অবাক হয়ে গেল। সে কখনো কল্পনাই করতে পারেনি, মরুভূমির মাঝখানে এ ধরনের কোনো তাঁবুর অস্তিত্ব থাকতে পারে। মেঝেটি সবচেয়ে সুন্দর কার্পেটে ঢাকা। এ ধরনের জিনিসের উপর দিয়ে সে আগে কখনো হাঁটেনি। উপর থেকে নেমে এসেছে সোনার কারুকাজ করা ঝাড়বাতি, প্রতিটিতে মোমবাতি জ্বালানো। গোত্রপতিরা তাঁবুর পেছনে ভারী কারুকাজ করা সিল্কের গদিতে অর্ধ বৃত্তাকারে বসেছেন। চাকরেরা রুপার ট্রে করে মসলাদার খাবার আর চা নিয়ে আসছে, যাচ্ছে। কয়েকজন চাকর হুক্কায় আগুন দেওয়ার কাজ করছে। ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধে ভরপুর পুরো তাঁবু।

ওখানে ছিলেন আট গোত্রপতি। তবে তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোত্রপতি তা বুঝতে ছেলেটার কোনো অসুবিধা হলো না। সাথে সাথেই সে চিনে ফেলল। তিনি সোনার কারুকাজ করা সাদা পোশাক পরে অর্ধ-বৃত্তটার কেন্দ্রে বসে আছেন। তার একপাশে ওই তরুণ আরব, যার সাথে আগে তার কথা হয়েছিল।

'শুভ-অশুভ ইঙ্গিতের কথা বলা এই পরদেশি কে?' ছেলেটার দিকে চেয়ে এক গোত্রপতি জানতে চাইলেন।

'এই আমিই,' ছেলেটা জবাব দিলো। তারপর সে যা দেখেছে, সব আবার বলল।

'মরুভূমি কেন এক আগন্তুককে এ ধরনের কথা জানাবে, যেখানে জানা আছে যে আমরা এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাস করছি?' আরেক গোত্রপতি বললেন।

'কারণ আমার চোখ এখনো মরুভূমির সাথে অভ্যস্ত নয়।' ছেলেটা বলল। 'আমি এমন কিছু দেখতে পারি, যা মরুভূমিতে অভ্যস্ত চোখ দেখতে পায় না।'

তাছাড়া আমি জগতের আত্মা সম্পর্কেও জানি, সে মনে মনে বলল।

'মরুদ্যান হলো নিরপেক্ষ এলাকা। কেউ কোনো মরুদ্যানে হামলা করে না,' তৃতীয় গোত্রপতি বললেন।

'যা ঘটেছে, আমি কেবল তা-ই বলতে পারি। যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে না চান, তবে আপনাদের কিছুই করতে হবে না।'

গোত্রপতিরা তখন প্রবল আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারা এমন আরবি উচ্চারণে কথা বলতে লাগলেন, যার কিছুই ছেলেটা বুঝতে পারল না। তবে সে চলে যেতে চাইলে পাহারাদার তাকে সেখানেই থাকতে বলল। ছেলেটা ভীত হয়ে পড়ল। শুভ-অশুভ ইঙ্গিত তাকে বলেছে, খারাপ কিছু হচ্ছে। মরুভূমিতে সে কী দেখেছে, তা উটচালককে বলার জন্য তার অনুতাপ হলো।

হঠাৎ করে মাঝখানে থাকা সবচেয়ে প্রবীণ গোত্রপতি হালকা হাসি দিলেন। এমন হাসি, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছেলেটার মনে কিছু স্বস্তি ফিরল। ওই লোক আলোচনায় অংশ নেননি। সত্যি বলতে কী, ওই পর্যায়ে তিনি একটি কথাও বলেননি। কিন্তু ছেলেটা ইতোমধ্যেই জগতের ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে পুরো তাঁবুতে শান্তির ছোঁয়া অনুভব করতে পারল। এখন তার মন বলছে, সে এসে ঠিক কাজই করেছে।

আলোচনা শেষ হলো। গোত্রপতিরা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হলেন। প্রবীণ ব্যক্তিটির কথা শুনতে চাইলেন তারা। তিনি ছেলেটার দিকে ফিরলেন : এবার তার অভিব্যক্তি শীতল ও গম্ভীর।

'দুই হাজার বছর আগে, অনেক দূর দেশে স্বপ্নে বিশ্বাস করা এক লোককে প্রথমে অন্ধকূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হলো,' বললেন প্রবীণ লোকটি। এখন তার উচ্চারণ বুঝতে পারছিল ছেলেটা। 'আমাদের সওদাগরেরা তাকে কিনে মিসরে নিয়ে এলেন। আমরা সবাই জানি, যে লোক স্বপ্নে বিশ্বাস করেন, তিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যাও করতে পারেন।'

প্রবীণ লোকটি বলে চললেন, 'ফেরাউন রোগা গরু আর তাজা গরু স্বপ্ন দেখার পর এ লোক দুর্ভিক্ষ থেকে মিসরকে রক্ষা করলেন। তার নাম ছিল যোশেফ [ইউসুফ]। তিনিও ছিলেন ভিনদেশের পরদেশি। তোমার মতোই, সম্ভবত তোমার বয়সীই।'

তিনি দম নিলেন। তার চোখ দুটি তখনো কঠোর।

'আমরা সবসময় ঐতিহ্য অনুসরণ করি। ঐতিহ্যই ওই যুগে মিসরকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেছিল, মিসরীয়দের সবচেয়ে সম্পদশালী জাতিতে পরিণত করেছিল। ঐতিহ্যই মানুষদেরকে শিক্ষা দেয়, কিভাবে মরুভূমি অতিক্রম করতে হয়, কিভাবে তাদের সন্তানদের বিয়ে দিতে হয়। ঐতিহ্যই বলে, মরুদ্যান হলো নিরপেক্ষ ভূমি। কারণ উভয় পক্ষের মরুদ্যান আছে, উভয় পক্ষই অরক্ষিত।'

প্রবীণ লোকটির কথা বলার সময় কেউ একটি শব্দও করছিল না।

'কিন্তু ঐতিহ্যই বলে, আমাদেরকে মরুভূমির বার্তায় বিশ্বাস করা উচিত। আমরা যাকিছু শিখেছি, সবই শিখিয়েছে মরুভূমি।'

প্রবীণ লোকটি ইশারা করলেন, সবাই দাঁড়িয়ে গেল। সভা শেষ। হুক্কাগুলো নিভে গেছে, পাহারারেরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ানো। ছেলেটা চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। তখনই প্রবীণ লোকটি আবার কথা বললেন :

'আগামীকাল আমরা মরুদ্যানে অস্ত্র বহন না করার ঐতিহ্যটি ভাঙতে চলেছি। সারা দিন আমরা শত্রুর অপেক্ষায় থাকব। সূর্য ডুবে গেলে সবাই আবার তাদের অস্ত্র জমা দেবে। শত্রুদের প্রতি ১০টি লাশের জন্য তুমি পাবে এক টুকরা করে সোনা।

'তবে তারা যদি যুদ্ধ না করে, তবে অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। মরুভূমির মতোই অস্ত্র খেয়ালি। সেগুলো ব্যবহার করা না হলে পরেরবার সেগুলো কাজ করে না। আগামীকালের মধ্যে যদি একটি অস্ত্রও ব্যবহার করা না হয়, তবে তোমার ওপর ব্যবহার করা হবে একটি।'

ছেলেটা যখন তাঁবু ত্যাগ করল, তখন মরুদ্যানে আছে কেবল পূর্ণিমার আলো। নিজের তাঁবুতে ফিরতে ছেলেটার লাগবে ২০ মিনিট। সে ওই দিকে চলতে শুরু করল।

কী ঘটেছে, সে ব্যাপারে সে ছিল সতর্ক। সে জগতের আত্মার মধ্য দিয়ে চলতে সফল হয়েছে। এখন এই কাজের মূল্য হতে পারে তার জীবন। এটি ভয়ঙ্কর বাজি। অবশ্য সে তার নিয়তিকে অনুসরণ করার জন্য ভেড়ার পাল বিক্রি করার দিনটি থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া খেলে চলেছে। আর ওই উটচালক তো বলেছে, আগামীকাল মারা যাওয়া অন্য যেকোনো দিন মরে যাওয়ার চেয়ে খারাপ নয়। প্রতি দিনই বেঁচে থাকার কিংবা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার দিন। সবকিছুই একটি মাত্র শব্দের ওপর নির্ভরশীল। তা হলো : '*মাকতুব*।'

নীরবতার মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা ছিল না। সে যদি আগামীকাল মরে যায়, তবে তা হওয়ার কারণ হবে ঈশ্বর চাননি ভবিষ্যত বদলে যাক। সে মরার আগে অন্তত একটি প্রণালী অতিক্রম করেছে, ক্রিস্টাল দোকানে কাজ করেছে, মরুভূমির নীরবতা জেনেছে এবং ফাতিমার চোখ দুটি দেখতে পেয়েছে। অনেক দিন আগে ঘর ছাড়ার পর থেকে সে প্রতিটি দিনেই তীব্রতা নিয়ে বেঁচে ছিল। সে যদি আগামীকালও মারা যায়, তবুও সে অন্য রাখালদের চেয়ে বেশি কিছু দেখে ফেলেছে। এর জন্য সে গর্বিত।

হঠাৎ সে বজ্রপাতের মতো বিকট শব্দ শুনতে পেল। প্রবল বাতাসের ঝাপটায় সে মাটিতে পড়ে গেল। এমন ধরনের বাতাসের সাথে তার পরিচয় ছিল না। ওখানকার মাটিতে তখন বাতাস এত প্রবল ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে যে ধুলায় চাঁদ পর্যন্ত আড়াল হয়ে গেছে। তার সামনে একটি বিশাল সাদা ঘোড়া। ভয়ঙ্কর শব্দ করছে।

চোখ অন্ধ করে দেওয়া ধুলা কমে এলে ছেলেটা যা দেখল, তাতে তার মধ্যে কাঁপন দেখা দিলো। বিশালদেহী প্রাণীটির পিঠে এক অশ্বারোহী, পুরোপুরি কালো পোশাক পরা। তার বাঁ কাঁধে একটি বাজপাখি বসে আছে। তিনি পাগড়ি পরেছেন, চোখ দুটি ছাড়া তার পুরো মুখ কালো রুমালে ঢাকা। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি মরুভূমি থেকে আসা বার্তাবাহক। তবে তার উপস্থিতি ছিল সাধারণ বার্তাবাহকের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

আগন্তুক ঘোড়সওয়ার তার জিনের খাপ থেকে বিশাল বাঁকানো তরবারি বের করলেন। চাঁদের আলোতে স্টিলের ব্লেডটি চমকাচ্ছিল।

'বাজপাখিদের উড়াউড়ির অর্থ কে পড়ার সাহস করেছে?' তিনি কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এত প্রচণ্ডভাবে কথা বলছিলেন যে মনে হলো আল-ফেয়ুমের ৫০ হাজার খেজুর গাছে তা প্রতিধ্বনিত হলো।

'আমিই তা করতে সাহস করেছি,' ছেলেটা বলল। অশ্বারোহী সান্তিয়াগো মামামোরোসের মূর্তিতে ঘোড়ার খুরের কাছে অবিশ্বাসীদের অবনত থাকার দৃশ্যের কথা মনে পড়ল তার। এ লোককে অবিকল সে রকমই দেখা যাচ্ছে, কেবল এখনকার ভূমিকা ঠিক উল্টা হওয়া ছাড়া।

'আমিই ওই কাজ করতে সাহস করেছি,' সে আবার বলল। সে তরবারির আঘাত নিতে তার মাথা নিচু করল। 'অনেক জীবন রক্ষা পাবে, কারণ জগতের আত্মার মাধ্যমে আমি দেখতে পেরেছি।'

তরবারিটি নেমে এলো না। বরং আগন্তুক সেটি ধীরে ধীরে নিচু করলেন। সেটি ছেলেটার কপালে এসে স্পর্শ করল। এক ফোঁটা রক্ত বের হলো।

অশ্বারোহী পুরোপুরি নিশ্চল, ছেলেটাও তেমনি। কিন্তু তবুও ছেলেটা পালাল না। তার হৃদয়ে অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করল : সে তার নিয়তি অনুসরণ করতে গিয়ে মরতে চলেছে। ফাতিমার জন্যও। যা-ই হোক, শুভ-অশুভ ইঙ্গিত সত্য ছিল। এখানে সে তার শত্রুর মুখোমুখি রয়েছে। তবে মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। জগতের আত্মা তার জন্য অপেক্ষা করছে। শিগগিরই সে এর অংশ হবে। আর আগামীকাল তার শত্রুরা হবে জগতের আত্মার অংশ।

আগন্তুক তখনো ছেলেটার কপালে তরবারি ঠেকিয়ে রেখেছেন। 'তুমি কেন পাখি দুটির উড়াউড়ি পড়তে গেলে?'

'পাখি দুটি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল বলেই আমি পড়েছি। তারা মরুদ্যানকে রক্ষা করতে চেয়েছে। পাখি দুটি বলল : কাল তোমরা সবাই মারা যাবে, কারণ তোমাদের চেয়ে মরুদ্যানে অনেক বেশি মানুষ আছে।'

তরবারিটি নড়ল না, ওখানেই থাকল। 'তুমি কি আল্লাহর ইচ্ছা বদলে দিতে চাও?'

'আল্লাহ সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছেন, তিনি বাজপাখিও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই আমাকে পাখিদের ভাষা শিখিয়েছেন। সবকিছুই একই হাতে লেখা হয়েছে,' ছেলেটা বলল, উটচালকের কথা মনে করে।

ছেলেটার কপাল থেকে তরবারি নামিয়ে নিলেন আগন্তুক। ছেলেটা সাথে সাথে ভয় থেকে মুক্তি অনুভব করল। তবে তখনো পালাল না।

'ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় সতর্ক থাকবে,' বললেন আগন্তুক। 'যখন কিছু লেখা হয়, তখন তা বদলানোর কোনো উপায় থাকে না।'

'আমি যা দেখেছি, তা হলো একটি সেনাবাহিনী,' ছেলেটা বলল। 'আমি যুদ্ধের ফলাফল দেখিনি।'

জবাবে আগন্তুক সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো। তবে তিনি হাতে তরবারি ধরেই রইলেন। 'এক বিদেশি ভিনদেশে কী করছে?'

'আমি আমার নিয়তির দিকে ছুটে চলেছি। এ আপনার বোঝার মতো বিষয় নয়।'

আগন্তুক খাপে ভরলেন তার তরবারি, ছেলেটা স্বস্তি পেল।

'তোমার সাহস পরীক্ষা করতে হলো আমার,' আগন্তুক বললেন। 'জগতের ভাষা বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো সাহস।'

ছেলেটা অবাক হলো। আগন্তুক এমন সব কথা বলছেন, যা খুব কম লোকই জানে।

'তুমি কখনো হাল ছাড়বে না, এমনকি এত কাছে এসেও,' তিনি বলতে থাকলেন। 'তোমাকে অবশ্যই মরুভূমিকে ভালোবাসতে হবে। তবে কখনো তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না। কারণ মরুভূমি সবাইকে পরীক্ষা করে : সে প্রতিটি পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে, যারা বিচ্যুত হয়, সে তাদেরকে মেরে ফেলে।'

তিনি যা বললেন, তাতে বুড়ো রাজার কথা মনে পড়ে গেল ছেলেটার।

'যোদ্ধারা এখানে এলে এবং সূর্যাস্তের পরও কাঁধের ওপর তোমার মাথা টিকে থাকলে, আমাকে খুঁজে বের করবে,' বললেন আগন্তুক।

যে হাত কিছুক্ষণ আগে তরবারি ধরেছিল, এখন তাতে একটি চাবুক। ঘোড়াটি আবার ডেকে উঠল, ধুলার মেঘ ছড়িয়ে পড়ল।

'আপনি কোথায় থাকেন?' চিৎকার করে বলল ছেলেটা। অশ্বারোহী তখন ছুটতে শুরু করেছেন।

চাবুক ধরা হাতটি দক্ষিণ দিকে দেখাল।

আলকেমিস্টের সাথে দেখা হলো ছেলেটার।

***

পর দিন সকালে অস্ত্র হাতে নিয়ে দুই হাজার লোক শত্রুর অপেক্ষায় পুরো আল-ফেয়ুম মরুদ্যানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। সূর্য মধ্য আকাশে উঠার আগ দিয়ে অনেক দূর দিগন্তে পাঁচ শ' গোত্রীয় লোক দেখা গেল। অশ্বারোহী সৈন্যরা মরুদ্যানে ঢুকল উত্তর দিক থেকে, মনে হলো তারা শান্তিপূর্ণ মিশনে বের হয়েছে। তবে তাদের সবার পোশাকের নিচে অস্ত্র লুকানো ছিল। তারা আল-ফেয়ুম মরুদ্যানের মাঝখানে থাকা সর্দারের সাদা তাঁবুতে ঢুকেই তাদের তরবারি আর রাইফেল বের করল। তারা ফাঁকা তাঁবুতে আক্রমণ চালাল।

মরুদ্যানের লোকজন মরুভূমি থেকে আসা অশ্বারোহীদের ঘিরে ফেলল। আধা ঘন্টার মধ্যে একজন বাদে সব হানাদার মারা পড়ল। শিশুদের খেজুর গাছের আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কী ঘটছিল, তারা কিছুই দেখল না। নারীরা তাদের তাঁবুতেই ছিল। তারা তাদের স্বামীদের সুরক্ষার জন্য দোয়া-দরুদ পড়ছিল। তারাও যুদ্ধ দেখল না। মাটিতে লাশগুলো পড়ে না থাকলে দিনটিকে অন্য সব স্বাভাবিক দিনের মতোই মনে হতো।

শত্রু সৈন্যদের কমান্ডারকেই কেবল হত্যা থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। ওই বিকেলে তাকে গোত্রপ্রধানদের সামনে হাজির করা হলো। কেন সে মরুভূমির ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে আক্রমণ করেছে জিজ্ঞাসা করা হলো। সে বলল, অনেক দিন যুদ্ধ করে করে তারা ক্ষুধা আর পিপাসায় ধুঁকছিল। আবার যাতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারে, সেজন্যই এই আক্রমণ।

সর্দার বললেন, তিনি তাদের দুর্দশার জন্য দুঃখিত। কিন্তু মরুভূমির ঐতিহ্য অত্যন্ত পবিত্র। সেই পবিত্রতা লঙ্ঘনের জন্য তিনি কমান্ডারকে লজ্জাজনকভাবে হত্যা করার হুকুম দিলেন। তাকে তরবারি বা বুলেট দিয়ে হত্যা না করে মরা খেজুর গাছে ফাঁসি দেওয়া হলো। মরুভূমির বাতাসে তার দেহ ঘুরপাক খেতে থাকল।

সর্দার এবার ছেলেটাকে ডাকলেন। তাকে তাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। তিনি আবারো মিসরে যোসেফের [ইউসুফ] কাহিনী বললেন। তিনি ছেলেটাকে মরুদ্যানের পরামর্শদাতা হওয়ারও আহ্বান জানালেন।

***

সূর্য ডোবার পর প্রথম তারাগুলো দেখা যাওয়ার সময় ছেলেটা দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র তাঁবু তার চোখে পড়ল। ছেলেটাকে পাশ দিয়ে যাওয়া একদল আরব বলল, এই এলাকা জিনদের আবাস। ছেলেটা সেখানে বসে অপেক্ষায় থাকল।

চাঁদটি অনেক উপরে উঠার পর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার আলকেমিস্টকে দেখা গেল। তিনি দুটি মৃত বাজপাখি তার কাঁধে করে নিয়ে এসেছেন।

'আমি এখানে,' ছেলেটা বলল।

'তোমার এখানে থাকার কথা নয়,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'নাকি তোমার নিয়তিই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে?'

'গোত্রীয় যুদ্ধের কারণে মরুভূমি অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ কারণেই আমি এখন এখানে।'

আলকেমিস্ট তার ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেটাকে তার সাথে তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করার ইঙ্গিত দিলেন। মরুভূমির আরো অনেক তাঁবুর মতোই এটি। ছেলেটা চারদিকে তাকাল, চুলা বা আলকেমিস্টদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি দেখা যায় কি-না দেখতে। কিন্তু ওগুলোর কিছুই দেখল না সে। ছেলেটা দেখল কেবল বইপুস্তকের স্তূপ, একটি রান্নার চুলা, কার্পেট, তাতে অনেক রহস্যময় নক্সা।

'বসো, পান করার জন্য কিছু আছে আমাদের, আর এই বাজপাখি দুটি খাব', বললেন আলকেমিস্ট।

আগের দিন সে যে দুটি বাজপাখি দেখেছিল, এরা ওগুলোই কিনা সংশয়ে থাকল ছেলেটা। তবে মুখে বলল না কিছুই। আলকেমিস্ট আগুন জ্বালালেন। একটু সময়ের মধ্যেই সুস্বাদু ঘ্রাণে তাঁবুটি ভরে গেল। হুক্কার গন্ধের চেয়ে এটা অনেক ভালো।

'আপনি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন কেন?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল।

'কারণ শুভ-অশুভের ইঙ্গিত,' আলকেমিস্টের জবাব। 'বাতাস আমাকে বলেছে, তুমি আসছ, আর তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

'বাতাস আমার কথা বলেনি। অন্য এক বিদেশির কথা বলেছে, ইংরেজ ভদ্রলোক। তিনিই আপনাকে খুঁজছেন।'

'তাকে আগে অন্য কিছু করতে হবে। তবে তিনি ঠিক পথেই রয়েছেন, মরুভূমি বোঝার চেষ্টা শুরু করেছেন।'

'আমার ব্যাপারটা কী?'

'যখন কেউ সত্যিই আন্তরিকভাবে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, পুরো মহাবিশ্ব তার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য একযোগে সহযোগিতা করে,' বললেন আলকেমিস্ট। তার কথায় বুড়ো রাজার বক্তব্য প্রতিধ্বনি হলো। ছেলেটা বুঝল, তাকে তার নিয়তি পূরণে সহায়তা করার জন্য এখানে আরো এক লোক তৈরি রয়েছেন।

'তাহলে আপনি আমাকে নির্দেশনা দিতে যাচ্ছেন?'

'না। তোমার যা যা জানা দরকার, তুমি আগেই তা জেনে গেছ। আমি কেবল এটুকুই তোমাকে জানাতে চাই যে তোমার গুপ্তধন কোন দিকে আছে।'

'কিন্তু গোত্রীয় যুদ্ধ তো চলছে,' ছেলেটা আবার বলল।

'মরুভূমিতে কী ঘটছে, তা আমি জানি।'

'আমি ইতোমধ্যেই আমার গুপ্তধন পেয়ে গেছি। আমার উট আছে, ক্রিস্টাল দোকান থেকে পাওয়া অর্থ আছে। আমার কাছে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রাও আছে। আমার নিজের দেশে আমি ধনী লোকে পরিণত হতে পারি।'

'কিন্তু ওসবের কিছুই তো পিরামিড থেকে পাওয়া যায়নি,' বললেন আলকেমিস্ট।

'ফাতিমাও আছে আমার। সে আমার পাওয়া অন্য যেকোনো সম্পদের চেয়ে বেশি দামি।'

'তাকেও তো পিরামিডে পাওয়া যায়নি।'

তারা চুপচাপ খেয়ে নিলো। আলকেমিস্ট একটি বোতল খুলে ছেলেটার কাপে লাল তরল ঢেলে দিলেন। তার পান করা সবচেয়ে সুস্বাদু মদ ছিল এই পানীয়।

'এখানে কি মদ নিষিদ্ধ নয়?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'মানুষের মুখে যা প্রবেশ করে, তা খারাপ নয়,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'তবে তাদের মুখ দিয়ে যা বের হয়, সেটিই খারাপ।'

আলকেমিস্ট ছিলেন কিছুটা সংযত। তবে ছেলেটা মদ পান করে স্বস্তি পেল। খাওয়া শেষ করে তারা তাঁবুর বাইরে বসলেন। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় তারাগুলো তখন নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে।

'পান করো, নিজেকে উপভোগ করো,' আলকেমিস্ট বললেন, ছেলেটার মধ্যে খুশির অনুভূতি দেখলেন তিনি। 'আজ রাতে ভালোমতো বিশ্রাম নাও। মনে করো, তুমি যোদ্ধা, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছ। মনে রাখবে, তোমার হৃদয় যেখানে থাকবে, সেখানেই তুমি তোমার গুপ্তধন খুঁজে পাবে। তোমাকে গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে, তাই চলার পথে শেখা প্রতিটি জিনিসকেই অর্থপূর্ণ বিবেচনা করতে হবে।

'আগামীকাল তোমার উটটি বিক্রি করে একটি ঘোড়া কিনবে। উট বিশ্বাসঘাতক : তারা হাজার হাজার কদম চলে, মনে হবে তারা ক্লান্ত হয়নি। তারপর হঠাৎ করে তারা হাঁটু মুড়ে মারা যায়। কিন্তু ঘোড়া ক্লান্ত হয় একটু একটু করে। তুমি সবসময়ই বুঝতে পারবে, তাদের কাছ থেকে তুমি কতটুকু পেতে পারবে। তারা মারা যাচ্ছে কি-না তা-ও আগে বোঝা যায়।'

***

পরের রাতে ছেলেটা একটি ঘোড়া নিয়ে আলকেমিস্টের ডেরায় হাজির হলো। আলকেমিস্টও প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। তিনি তার নিজের তেজি ঘোড়ায় চড়লেন, বাজপাখিটিকে বাঁ কাঁধে রাখলেন। তিনি ছেলেটাকে বললেন, 'মরুভূমিতে কোথায় জীবন আছে, আমাকে দেখাও। যারা জীবনের এ ধরনের লক্ষণ দেখতে পারে, কেবল তারাই গুপ্তধন খুঁজে পেতে পারে।'

তারা বালির উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, চাঁদ তাদের পথে আলো ফেলতে লাগল। আমি মরুভূমিতে জীবন খুঁজতে পারব কি-না জানি না, ছেলেটা ভাবল। আমি তো মরুভূমিকেই এখন পর্যন্ত ভালো মতো চিনি না।

সে কথাটি আলকেমিস্টকে বলতে চাইল, কিন্তু লোকটিকে তার ভয় করছিল। তারা এক পাথুরে জায়গায় পৌঁছালেন। এখানকার আকাশেই ছেলেটা বাজপাখি দুটি দেখেছিল। তবে এখন কেবলই নীরবতা আর বাতাস।

'মরুভূমিতে কিভাবে জীবন খুঁজতে হয়, আমি জানি না,' ছেলেটা বলল। 'আমি জানি, এখানে জীবন আছে, কিন্তু কিভাবে খুঁজব, তা জানি না।'

'জীবন আকর্ষণ করে জীবনকে,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন।

তার কথা বুঝতে পারল ছেলেটা। সে তার ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিলো। ঘোড়াটি পাথর আর বালুর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকল। ছেলেটার ঘোড়াকে অনুসরণ করে আলকেমিস্ট প্রায় আধা ঘণ্টা চললেন। তারা আর মরুভূমির খেজুর গাছ দেখতে পাচ্ছিলেন না। কেবল বিশাল চাঁদ রয়েছে মাথার উপরে। আর আছে মরুভূমির পাথরগুলোতে চাঁদের আলোর প্রতিফলন। হঠাৎ করে, দৃশ্যত কোনো কারণ ছাড়াই ছেলেটার ঘোড়ার গতি কমতে লাগল।

'এখানে জীবন আছে,' ছেলেটা বলল আলকেমিস্টকে। 'আমি মরুভূমির ভাষা জানি না, তবে আমার ঘোড়া জীবনের ভাষা জানে।'

তারা ঘোড়া থেকে নামলেন। আলকেমিস্ট কিছুই বললেন না। ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে তারা পাথরগুলোতে অনুসন্ধান চালালেন। হঠাৎ থামলেন আলকেমিস্ট। তিনি মাটির দিকে ঝুঁকলেন। পাথরগুলোর মাঝে একটি গর্ত আছে। আলকেমিস্ট গর্তের মধ্যে হাত ঢোকালেন। তারপর পুরো বাহুই ঢুকিয়ে দিলেন, একেবারে কাঁধ পর্যন্ত। সেখানে কিছু নড়ছে। আর ছেলেটা কেবল আলকেমিস্টের চেষ্টা করা দেখতে পেল তার চোখ দুটি তির্যক হয়ে যাওয়ার মধ্যে। তার হাত সম্ভবত গর্তের মধ্যে থাকা কোনো কিছুর সাথে লড়াই করছে। তারপর একটি গতি ছেলেটাকে চমকে দিলো। আলকেমিস্ট হাত বের করলেন, লাফ দিলেন। তিনি একটি সাপের লেজ ধরে আছেন।

ছেলেটাও লাফ দিলো, তবে আলকেমিস্টের কাছ থেকে দূরে। সাপটি পাগলের মতো লড়াই করেছিল। মরুভূমির নীরবতা ছিন্নভিন্ন করে হিস হিস করছিল। গোখড়া সাপ। এর বিষ যেকোনো মানুষকে কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যুপুরীতে পাঠাতে পারে।

'এর বিষের দিকে লক্ষ্য রাখবেন,' ছেলেটা বলল। অবশ্য আলকেমিস্ট যখন গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন, তখন নিশ্চয় তার হাতে সাপ ছোবল মেরেছে। কিন্তু তবুও তাকে শান্ত মনে হচ্ছে। 'আলকেমিস্টের বয়স ২০০ বছর,' ইংরেজ ভদ্রলোক তাকে বলেছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানেন, মরুভূমির সাপ কিভাবে কাবু করতে হয়।

ছেলেটা দেখল, তার সঙ্গী নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে একটি ছোরা নিয়ে এলেন। তা দিয়ে বালিতে একটি বৃত্ত এঁকে সেখানে সাপটিকে ছেড়ে দিলেন। সাপটি সাথে সাথে শান্ত হয়ে পড়ল।

'উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই,' বললেন আলকেমিস্ট। 'সাপটি এই বৃত্ত থেকে বের হতে পারবে না। তুমি মরুভূমিতে জীবন খুঁজে পেয়েছ। আমার এই শুভ সঙ্কেতের দরকার ছিল।'

'এমন কিছু কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?'

'কারণ পিরামিড ঘিরে আছে মরুভূমি।'

ছেলেটা এখন পিরামিড নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিল না। তার হৃদয় ভারী হয়ে আছে। আগের রাত থেকে সে বিষণ্নতায় আক্রান্ত। গুপ্তধন খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মানে ফাতিমাকে ছেড়ে যাওয়া।

'আমি মরুদ্যানে থাকতে চাই,' ছেলেটা জবাব দিলো। 'আমি ফাতিমাকে পেয়েছি, আর আমি যতটুকু জানি, সে গুপ্তধনের চেয়েও মূল্যবান।'

'ফাতিমা মরুভূমির মেয়ে,' বললেন আলকেমিস্ট। 'সে জানে, ফেরার জন্যই পুরুষদের দূরে চলে যেতে হয়। আর তার কাছে তার সম্পদ এসে গেছে। তা হলো তুমি। এখন সে আশা করে, তুমি যা খুঁজছ, তা খুঁজতে থাকবে।'

'আচ্ছা, আমি থেকে গেলে কী হবে?'

'কী হবে, তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। তুমি হবে মরুদ্যানের উপদেষ্টা। অনেক ভেড়া আর উট কেনার মতো স্বর্ণ তোমার কাছে আছে। তুমি ফাতিমাকে বিয়ে করবে। তোমরা দুজনে এক বছর সুখী থাকবে। তুমি মরুভূমিকে ভালোবাসতে শিখবে। ৫০ হাজার খেজুর গাছের একেবারে প্রতিটাকে তুমি চিনবে। গাছগুলো বড় হতে দেখবে তুমি, দুনিয়া কিভাবে সবসময় বদলাতে থাকে, তা বুঝতে পারবে। তুমি আরো ভালোভাবে শুভ-অশুভ ইঙ্গিত বুঝতে পারবে। কারণ মরুভূমিই সবচেয়ে ভালো শিক্ষক।

'দ্বিতীয় বছরের কোনো একসময় গুপ্তধনের কথা মনে পড়বে তোমার। ইঙ্গিতগুলো ক্রমাগত তা নিয়ে বলতে থাকবে। তুমি সেগুলো অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করবে। তুমি মরুদ্যান এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণে তোমার জ্ঞান ব্যবহার করবে। গোত্রপ্রধানরা তোমার কাজের প্রশংসা করবেন। আর উটগুলো তোমার সম্পদ ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে।

'তৃতীয় বছরে শুভ-অশুভ ইঙ্গিতগুলো গুপ্তধন ও নিয়তি সম্পর্কে বলা অব্যাহত রাখবে। তুমি মরুদ্যানে রাতের পর রাত হেঁটে বেড়াবে। ফাতিমা অসুখী হবে। কারণ তার মনে হবে, সে-ই তোমার অনুসন্ধানে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তুমি তাকে ভালোবেসে যাবে। বিনিময়ে সে-ও তোমাকে ভালোবাসবে। তোমার মনে পড়বে, সে কখনো তোমাকে থেকে যেতে বলেনি। কারণ মরুভূমির নারী জানে, তাকে অবশ্যই পুরুষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ কারণে তুমি তাকে দোষ দিতে পারো না। তবে অনেকবার মরুভূমির বালির উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, চিন্তা করবে, তুমি যেতে পারতে।... গেলেই ফাতিমার জন্য তোমার ভালোবাসা আরো বেশি বিশ্বস্ত হতো। কারণ যে জিনিসটি মরুদ্যানে তোমাকে আটকে রেখেছিল, তা হলো

এই ভয় যে হয়তো ফিরতে পারবে না। ওই পর্যায়ে ইঙ্গিতগুলো বলবে, তোমার গুপ্তধন এখনো চাপা পড়ে আছে।

'তারপর চতুর্থ বছরের কোনো এক সময় ইঙ্গিতগুলো তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কারণ তুমি তাদের কথা শোনা বন্ধ করে দিয়েছ। গোত্রপ্রধানরা তা বুঝবেন। তারপর তোমাকে উপদেষ্টার পদ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে। তবে তুমি তত দিনে ধনী সওদাগরে পরিণত হয়েছ। অনেক উট আর বিশাল ব্যবসা আছে তোমার। বাকি জীবন এটা জেনে কাটাবে, তুমি তোমার নিয়তির পথে চলোনি, আর এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, ভালোবাসা কখনো কোনো পুরুষকে তার নিয়তি অনুসন্ধান থেকে বিরত রাখে না। কেউ যদি অনুসন্ধান বন্ধ করে দেয়, তবে তার কারণ ওই ভালোবাসা পৃথিবীর ভাষায় বলে এমন সত্যিকারের ভালোবাসা ছিল না...।'

আলকেমিস্ট বালুর বৃত্তটি মুছে ফেললেন। সাপটি এঁকেবেঁকে পাথরের মধ্যে হারিয়ে গেল। ছেলেটার মনে পড়ল ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর কথা। তিনি সবসময় মক্কায় যেতে চাইতেন। আর ইংরেজ ভদ্রলোকের কথাও স্মরণে এলো। তিনি আলকেমিস্টের খোঁজ করতেন। মরুভূমিকে বিশ্বাস করে - এমন এক নারীর কথাও তার চিন্তায় এলো। ভাবতে ভাবতে সে মরুভূমির দিকে তাকাল। এই মরুভূমি তাকে তার ভালোবাসার নারীর কাছে নিয়ে এসেছে।

তারা তাদের ঘোড়ায় চড়লেন। এবার মরুদ্যানের পথে আলকেমিস্টকে অনুসরণ করে চলল ছেলেটা। বাতাস তাদের কাছে মরুদ্যানের শব্দ বয়ে আনছিল, ছেলেটা ফাতিমার কণ্ঠ শোনার চেষ্টা করল।

ওই রাতে সে যখন বৃত্তাবদ্ধ গোখড়া সাপ দেখছিল, তখন কাঁধে বাজপাখি থাকা অদ্ভুত ঘোড়সওয়ার তাকে ভালোবাসা ও গুপ্তধনের কথা বলেছিলেন, মরুভূমির নারী ও তার নিয়তির কথা শুনিয়েছিলেন।

'আমি আপনার সাথে যাচ্ছি,' ছেলেটা বলল। সাথে সাথে সে তার হৃদয়ে শান্তি অনুভব করল।

'আমরা কাল সূর্যোদয়ের আগে রওনা হবো,' আলকেমিস্টের একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল।

***

রাতে ছেলেটার দুই চোখে একটুও ঘুম এলো না। সূর্য ওঠার দুই ঘণ্টা আগে সে তার তাঁবুতে ঘুমানো ছেলেদের একজনকে জাগাল। ফাতিমা যেখানে থাকে, তা দেখিয়ে দিতে বলল। তারা ফাতিমার তাঁবুর দিকে গেল। ছেলেটা তার বন্ধুকে একটি ভেড়া কেনার মতো পর্যাপ্ত স্বর্ণ দিলো।

তারপর সে তার বন্ধুকে বলল, ফাতিমা যে তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে, সেখানে গিয়ে তাকে জাগিয়ে তাকে বলতে যে সে বাইরে অপেক্ষা করছে। আরব বালক তার কথামতো কাজ করল। তাকে আরেকটি ভেড়া কেনার মতো স্বর্ণ দেওয়া হলো।

'এখন আমাদের একাকী ছেড়ে যাও,' ছেলেটা বলল আরব বালককে। আরবটি তার তাঁবুতে ফিরে গেল ঘুমাতে। মরুদ্যানের উপদেষ্টাকে সহায়তা করতে পেরে সে গর্বিত হয়েছিল। তাছাড়া তার কাছে এখন দুটি ভেড়া কেনার মতো যথেষ্ট অর্থ আছে।

ফাতিমা তাঁবুর প্রবেশপথে এলো। দুজন খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটল। ছেলেটা জানত, এটি ঐতিহ্যের লঙ্ঘন। কিন্তু এখন সে কোনো কিছুর পরোয়া করে না।

'আমি চলে যাচ্ছি,' সে বলল। 'তবে আমি তোমাকে জানাতে চাই, আমি ফিরে আসব। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ...'

'আর কিছুই বলো না,' ফাতিমা বাধা দিলো। 'কেউ ভালোবাসে বলেই ভালোবাসে। ভালোবাসার জন্য কোনো কারণ প্রয়োজন হয় না।'

তবে ছেলেটা বলে চলল, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে। এক রাজার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমি ক্রিস্টাল বিক্রি করেছি, আমি মরুভূমি পাড়ি দিয়েছি। গোত্রগুলো যুদ্ধ করছে বলেই আমি কূপের কাছে গিয়েছিলাম, আলকেমিস্টকে খুঁজতে। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ পুরো মহাবিশ্ব আমাকে একযোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে তোমাকে খুঁজে পেতে।'

তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। এই প্রথম তারা একে অপরকে স্পর্শ করল।

'আমি ফিরে আসব,' ছেলেটা বলল।

'এর আগে আমি সবসময় মরুভূমির দিকে আকুলতা নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম,' বলল ফাতিমা। 'এখন আমার সাথে থাকবে আশা। আমার বাবা একদিন চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমার মায়ের কাছে ফিরে এসেছেন। আর তারপর থেকে তিনি সবসময় ফিরে আসেন।'

তারা আর কিছুই বলল না। তারা খেজুর গাছের ভিড়ে আরেকটু হাঁটল। তারপর ছেলেটা তাকে তার তাঁবুর প্রবেশপথে রেখে চলে গেল।

'আমি ফিরব, ঠিক যেভাবে তোমার মায়ের কাছে তোমার বাবা ফিরে আসেন,' সে বলল।

সে দেখল, ফাতিমার চোখ দুটি পানিতে ভরা।

'তুমি কাঁদছ?'

'আমি মরুভূমির নারী,' মেয়েটা বলল, মুখ ঘুরিয়ে। 'কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো নারী।'

ফাতিমা তার তাঁবুতে ফিরে গেল। দিনের আলো ফুটে ওঠলে বছরের পর বছর ধরে করে আসা গৃহস্থালী কাজকর্ম করতে বের হলো। কিন্তু সবকিছুই বদলে

গেছে। ছেলেটা এখন আর মরুদ্যানে নেই। এ মরুদ্যান আর কোনো দিন এই গতকালের মতোও মনে হবে না। এটি আর ৫০ হাজার খেজুর গাছ, ৩০০ কুয়োর জায়গা নয়, যেখানে তীর্থযাত্রীরা আসে, দীর্ঘ সফরের পর বিশ্রাম নেয়। এখন থেকে মরুদ্যান তার কাছে ফাঁকা জায়গা মনে হবে।

ওই দিন থেকে মরুভূমি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সে প্রতিদিন সেদিকে তাকাবে। ভাবার চেষ্টা করবে, কোন তারাটিকে অনুসরণ করে ছেলেটা গুপ্তধনের খোঁজে চলেছে। সে বাতাসে চুমু ছুঁড়ে দেবে এই আশায় যে বাতাস ছেলেটার মুখ স্পর্শ করবে, তাকে বলবে সে জীবিত আছে। অর্থাৎ সে তার জন্য অপেক্ষা করছে, এক নারী প্রতীক্ষা করছে গুপ্তধন খোঁজায় নিয়োজিত সাহসী পুরুষের জন্য। ওই দিনের পর মরুভূমি তার কাছে কেবল একটি জিনিসেরই প্রতিনিধিত্ব করে : ছেলেটার প্রত্যাবর্তনের আশা।

***

'পেছনে যা ফেলে গেলে, তা নিয়ে ভেব না,' আলকেমিস্ট বললেন ছেলেটাকে। তারা মরুভূমির বালির উপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন। 'সবকিছুই জগতের আত্মায় লেখা আছে। সেখানেই চির দিন থাকবে।'

'পুরুষেরা ঘর ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে ঘরে ফেরার স্বপ্নই বেশি দেখে,' ছেলেটা বলল। সে এর মধ্যেই মরুভূমির নীরবতার সাথে আবার অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

'কারো পাওয়া বস্তু যদি খাঁটি জিনিস হয়, তবে তা কখনো নষ্ট হবে না। আর যেকোনো লোক যেকোনো সময় ফিরে আসতে পারে। আর তুমি যদি এমন কিছু পাও যা স্রেফ আলোর একটি মুহূর্ত, যেমন কোনো তারার বিস্ফোরণ, তবে তুমি বিনিময়ে কিছুই পাবে না।'

লোকটি আলকেমির ভাষায় কথা বলছিলেন। তবে ছেলেটা জানত, তিনি ফাতিমার কথা উল্লেখ করছেন।

পেছনে যা কিছু ফেলে যাওয়া হলো, তা নিয়ে চিন্তা না করা কঠিন। সীমাহীন একঘেয়েমি নিয়ে থাকা মরুভূমি তার মধ্যে স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা এখনো খেজুর গাছ দেখতে পায়, কূপ দেখতে পায়, তার ভালোবাসার নারীর চেহারা দেখতে পায়। সে দেখতে পায়, ইংরেজ ভদ্রলোক তার পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ওই উটচালকের মুখও তার সামনে ভাসে। ওই লোক সত্যিকারের শিক্ষক, যদিও সে তা নিজেও জানে না। হয়তো আলকেমিস্ট কখনো প্রেমে পড়েননি, ছেলেটা ভাবল।

আলকেমিস্টের ঘোড়া সামনে, বাজপাখি তার কাঁধে। বাজও মরুভূমির ভাষা জানে। যখনই তারা থামে, সে শিকারের সন্ধানে উড়ে যায়। প্রথম দিন সে একটি খরগোশ নিয়ে এলো। দ্বিতীয় দিন ফিরল দুটি পাখি নিয়ে।

রাতে তারা ঘুমানোর বিছানা পাতে, আগুন লুকিয়ে রাখে। মরুভূমির রাত ঠাণ্ডা। চাঁদের পরিক্রমার ধাপে ধাপে অন্ধকার আরো বেশি ঘন হয়ে আসে। তারা এক সপ্তাহ ধরে চলছেন। গোত্রীয় যুদ্ধ এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে যতটুকু কথা বলা দরকার তাদের, কেবল ততটুকুই বলেন। যুদ্ধ চলছেই। বাতাস অনেক সময় ঘাম, রক্তের অসুস্থ গন্ধ বয়ে আনে। কাছেই যুদ্ধ হচ্ছে। বাতাস ছেলেটাকে মনে করিয়ে দেয়, ইঙ্গিতের ভাষা আছে। চোখে না দেখা জিনিসও ওগুলো তাকে দেখিয়ে দিতে সবসময় প্রস্তুত থাকে।

সপ্তম দিনে স্বাভাবিক সময়ের আগেই ক্যাম্প খাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন আলকেমিস্ট। বাজপাখিটি শিকারের সন্ধানে বের হলো। ছেলেটার দিকে পানির পাত্র এগিয়ে দিলেন আলকেমিস্ট।

'তুমি তোমার সফরের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছ,' বললেন আলকেমিস্ট। 'স্বপ্নের পেছনে ছোটার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'কিন্তু আপনি পথে কিছুই বলেননি,' ছেলেটা বলল। 'ভেবেছিলাম, আপনার জ্ঞানের কিছু অংশ আমাকে শেখাবেন। কিছু দিন আগে মরুভূমির পথে এক লোকের সাথে ছিলাম। তার কাছে আলকেমির বই ছিল। কিন্তু সেগুলো পড়তেই পারিনি।'

'শেখার পথ আছে একটিই,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'কাজের মাধ্যমে। তোমার যা জানার দরকার, সেসবের সবকিছুই তুমি সফরের মাধ্যমে শিখে নিয়েছ। তোমার কেবল আর একটি জিনিস শেখা দরকার।'

ছেলেটা জানতে চাইল, সেটা কী। আলকেমিস্ট তখন দিগন্তে কিছু অনুসন্ধান করছেন। তিনি তার বাজপাখিটির জন্য অপেক্ষা করছেন।

'আপনাকে কেন আলকেমিস্ট বলা হয়?'

'কারণ আমি যে আলকেমিস্ট।'

'আচ্ছা, অন্য আলকেমিস্টরা কেন সোনা বানানোর চেষ্টা চালানোর পরও তা করতে ব্যর্থ হন?'

'তারা কেবল সোনাই খোঁজে,' তার সাথী জবাব দিলেন। 'তারা তাদের সম্পদের নিয়তির খোঁজ করে। সত্যিকার অর্থে তারা নিয়তিকে নিয়ে বাস করতে চায় না।'

'আমার জানা দরকার ওই বিষয়টি কী?' ছেলেটা জানতে চাইল।

আলকেমিস্ট দিগন্তের দিকেই তাকিয়ে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত বাজপাখিটি ফিরে এলো তাদের খাবার নিয়ে। আগুনের শিখা যাতে দেখা না যায়, সেজন্য তারা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালালেন।

'আমি আলকেমিস্ট স্রেফ এ কারণে যে আমি আলকেমিস্ট,' তিনি বললেন। তিনি তখন খাবার প্রস্তুত করছেন। 'আমার দাদার কাছ থেকে এই বিজ্ঞান শিখেছি।

তিনি শিখেছেন তার বাবার কাছ থেকে। এভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যন্ত চলেছে। ওই সময় সেরা সৃষ্টি স্রেফ পান্নার উপর লেখা যেত। কিন্তু মানুষ সাদামাটা জিনিস বাতিল করে পুস্তিকা, ব্যাখ্যা, দার্শনিক সমীক্ষা লিখতে শুরু করে দিলো। তারা এমনও মনে করতে শুরু করল যে তারা অন্যদের চেয়ে ভালো পন্থা জানে। অথচ এখনো পান্নার ট্যাবলেট টিকে আছে।'

'পান্নার ট্যাবলেটে কী লেখা আছে?' ছেলেটা জানতে চাইল। আলকেমিস্ট বালিতে আঁকতে শুরু করলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার লেখা শেষ হলো। তার আঁকার সময় ছেলেটার বুড়ো রাজার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, সেদিন বাজারে তার সাথে দেখা হয়েছিল। অথচ এখন মনে হয়, তা অনেক অনেক বছর আগের কথা।

'পান্নার ট্যাবলেটে এই লেখা হয়েছে,' শেষ করে বললেন আলকেমিস্ট।

বালিতে কী লেখা হয়েছে, তা পড়ার চেষ্টা করল ছেলেটা।

'এটি কোড,' ছেলেটা কিছু হতাশ হয়ে বলল। 'মনে হচ্ছে, ইংরেজ ভদ্রলোকের বইগুলোতেও আমি এমন দেখেছি।

'না' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'এটি ওই দুই বাজপাখির লড়াই করার মতো; কেবল যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যাবে না। পান্নার ট্যাবলেট সরাসরি জগতের আত্মার বার্তা।

'জ্ঞানীরা বোঝে, এই প্রাকৃতিক দুনিয়া স্রেফ স্বর্গের একটি ছবি আর প্রতিলিপি। এই পৃথিবীর অস্তিত্ব স্রেফ এই নিশ্চয়তাই দিচ্ছে, নিখুঁত একটি পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে। ঈশ্বরের পৃথিবী সৃষ্টির কারণ হলো, যাতে এর দৃশ্যমান বস্তুরাজির মাধ্যমে মানুষ তার আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও তার বিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে। কাজ বলতে আমি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছি।'

'আমি কি পান্নার ট্যাবলেটে লেখা পড়তে পারব?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'হয়তো পারবে, যদি তুমি আলকেমির গবেষণাগারে থাকো। পান্নার ট্যাবলেট বোঝার জন্য সেই স্থানই সবচেয়ে ভালো জায়গা। তবে তুমি এখন আছ মরুভূমিতে। তা-ই তুমি নিজেকে এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। মরুভূমিই তোমাকে পৃথিবী বুঝিয়ে দেবে। আসলে কী, দুনিয়ার পিঠে থাকা সবকিছুই তা করবে। এমনকি মরুভূমিও তোমার বোঝার দরকার নেই। তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, বালির একটি সাধারণ কণার সাথে আন্তরিকতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। তুমি এর মধ্যেই সৃষ্টির বিস্ময় দেখতে পাবে।'

'আমি কিভাবে মরুভূমির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেব?'

'তোমার হৃদয়ের কথা শোনো। সে সবকিছু জানে। কারণ সে এসেছে জগতের আত্মার কাছ থেকে। আর একদিন সে সেখানেই ফিরে যাবে।'

***

তারা নীরবে আরো দুই দিন মরুভূমি পাড়ি দিলেন। আলকেমিস্ট আরো সতর্ক হয়ে গেছেন। তারা যে এলাকার দিকে চলছিলেন, সেখানেই হচ্ছিল সবচেয়ে সহিংস যুদ্ধ। তারা পাশাপাশি যাচ্ছিলেন। ছেলেটা তার হৃদয়ের কথা শোনার চেষ্টা করেছিল।

কাজটি সহজ নয়। আগে তার হৃদয় সবসময় তার গল্প বলতে তৈরি হয়ে থাকত। কিন্তু পরের দিকে তেমন হচ্ছে না। একসময় ছিল, তার হৃদয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দুঃখের কথা বলত, অনেক সময় মরুভূমির সূর্যোদয়ে এতই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠত যে ছেলেটাকে তার কান্না লুকাতে হতো। তার হৃদ-কম্পন অনেক বেড়ে যেত, যখন সে ছেলেটাকে গুপ্তধনের কথা শোনাত। আর যখন সে মরুভূমির সীমাহীন দিগন্তের দিকে তাকাতো, তখন তা অনেক কমে যেত। তবে তার হৃদয় কখনো থামেনি। এমনকি ছেলেটা ও আলকেমিস্ট যখন নীরব থাকেন, তখনো।

'আমাদের কেন হৃদয়ের কথা শুনতে হবে?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল। তারা তখন ওই দিনের জন্য ক্যাম্প তৈরি করে ফেলেছেন।

'কারণ তোমার হৃদয় যেখানে আছে, সেখানেই খুঁজে পাবে তোমার গুপ্তধন।'

'কিন্তু আমার হৃদয় তো ক্ষুব্ধ,' ছেলেটা বলল। 'হৃদয়ের আছে নিজের স্বপ্ন, সে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, সে মরুভূমির এক নারীর জন্য ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সে আমার কাছে অনেক কিছু চায়, আমি যখন ওই নারীর কথা ভাবতে থাকি, তখন আমার অনেক রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।'

'আচ্ছা, তা ভালো। তোমার হৃদয় জীবন্ত। সে যা বলে তা শুনবে।'

পরের তিন দিন দুই মুসাফির অনেক সশস্ত্র গোত্রীয় লোকজনকে অতিক্রম করে গেলেন। আরো অনেককে তারা দেখলেন দিগন্তে। ছেলেটার হৃদয় ভয়ের কথা বলতে শুরু করল। সে তাকে জগতের আত্মার কাছ থেকে শোনা গল্প শোনাত, গুপ্তধনের সন্ধানে বের হয়ে ব্যর্থ হওয়া লোকদের কথা বলত। অনেক সময় ছেলেটাকে ভয় দেখাত এই বলে, সে হয়তো গুপ্তধন খুঁজে পাবে না কিংবা সে মরুভূমিতে মারাও যেতে পারে। আবার কখনো কখনো সে ছেলেটাকে বলত, সে সন্তুষ্ট : সে ভালোবাসা ও সম্পদ পেয়েছে।

'আমার হৃদয় বিশ্বাসঘাতক,' ছেলেটা বলল আলকেমিস্টকে। তারা তখন ঘোড়া দুটিকে বিশ্রামে রাখার চেষ্টা করছিল। 'সে চায় না, আমি এগুতে থাকি।'

'এটি ভালো ব্যাপার,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'স্বাভাবিকভাবেই সে ভয় পায়, স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে তুমি হয়তো যা কিছু জয় করেছ, সবই খুইয়ে ফেলবে।'

'তা-ই যদি হয়, তাহলে আমি কেন আমার হৃদয়ের কথা শুনব?'

'কারণ তুমি আর কখনোই তাকে শান্ত করতে পারবে না। এমনকি যদি এমন ভানও করো, তার কথা শুনছ না। সে সবসময় তোমার ভেতরে থাকবে, তুমি জীবন নিয়ে, দুনিয়া নিয়ে যা ভাবছ, সবকিছুর পুনরাবৃত্তি করবে।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমার উচিত হবে শোনা, এমনকি সে যদি বিশ্বাসঘাতকও হয়?'

'বিশ্বাসঘাতকতা হলো একটি আঘাত, এটি আসে অপ্রত্যাশিতভাবে। তুমি যদি তোমার হৃদয়কে ভালোমতো চেনো, সে কখনো তোমার সাথে তেমন কাজ করতে পারবে না। কারণ তুমি তখন তার স্বপ্ন ও ইচ্ছা জানবে, বুঝবে কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হয়।

'তুমি কখনো তোমার হৃদয় থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। তা-ই সে যা বলে তা শোনাই ভালো। আর এভাবেই তুমি পারবে অপ্রত্যাশিত কোনো আঘাতের ভয়ে ভীত না হতে।'

ছেলেটা মরুভূমি অতিক্রম করার সময় তার হৃদয়ের কথা শুনেই যেতে লাগল। সে এর ছল-চাতুরি, ধোঁকাবাজি বুঝে ফেলেছে, এখন সে সবকিছু ঠিকঠাক বুঝতে পারে। সে এখন আর ভয় পায় না, মরুদ্যানে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছে। কারণ একদিন তার হৃদয় বলল, সে খুশি। 'আমি যদিও অনেক সময় অভিযোগ করি,' সে বলল, 'এর কারণ হলো আমি এক লোকের হৃদয়, আর মানুষের হৃদয় তো এমন করবেই। মানুষ তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ভয় পায়। কারণ তারা মনে করে, তারা এর যোগ্য নয় কিংবা তারা তা জয় করতে অক্ষম। আমরা, তাদের হৃদয়েরা, ভীত হয়ে ওঠি কেবল এই ভেবে যে প্রিয়জনেরা দূরে চলে যেতে পারে, যে সময়টি ভালো হতে পারত, তা তেমন হয়নি; কিংবা যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারত তা বালির নিচেই চির দিনের জন্য রয়ে গেছে। এসব যখন ঘটে, তখন আমরা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হই।'

'আমার হৃদয় ভীত এই ভেবে যে তাকে ভুগতে হবে,' ছেলেটা আলকেমিস্টকে এক রাতে বলেছিল। আকাশে তখন চাঁদ ছিল না। তারা তখন নিকষ কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

'তোমার হৃদয়কে বলো, কষ্ট ভোগ করার চেয়ে কষ্টের ভয়ে থাকা অনেক খারাপ। আর কেউ যখন তার স্বপ্নের পেছনে ছোটে, তখন কোনো হৃদয়ই কষ্টে থাকে না। কারণ অনুসন্ধানের প্রতিটি ক্ষণই ঈশ্বর ও শাশ্বতের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্ত।'

'অনুসন্ধানের প্রতিটি মুহূর্তই ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের সময়,' ছেলেটা তার হৃদয়কে বলল। 'আমি যখন সত্যিই আমার গুপ্তধন অনুসন্ধান করতে থাকি, তখন প্রতিটি দিন হয় উজ্জ্বল। কারণ আমি জানি, প্রতিটি ঘণ্টাই আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার অংশ। আমার যদি সাহস না থাকত, আমি যদি মনে করতাম, আমার মতো একজন রাখালের পক্ষ এমন সাফল্য লাভ অসম্ভব, তবে স্বপ্ন পূরণের পথে আমি যা কিছু আবিষ্কার করেছি, তা করতে পারতাম না।

এর ফলে তার হৃদয় সারা বিকাল শান্ত থাকল। ওই রাতে ছেলেটার গভীর ঘুম হলো। জাগার পর হৃদয় তাকে জগতের আত্মা থেকে যাকিছু এসেছে সেগুলো সম্পর্কে বলল। সে বলল, সুখী লোকদের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন। আর ওই সুখ পাওয়া যেতে পারে মরুভূমির বালিকণার মধ্যে। আলকেমিস্ট এমনই বলছিলেন। কারণ বালির একটি কণা হলো সৃষ্টির একটি মুহূর্ত, মহাবিশ্বের এটি সৃষ্টি করতে লেগেছে কোটি কোটি বছর। 'পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্যই গুপ্তধন অপেক্ষা করে আছে,' তার হৃদয় বলল। 'আমরা, মানুষের হৃদয়গুলো, খুব কমই এসব গুপ্তধন সম্পর্কে বলি। কারণ লোকজন সেগুলো আর খুঁজতে চায় না। আমরা কেবল শিশুদেরই সে সম্পর্কে বলি। পরে আমরা জীবনকে কেবল চলতে দেই, তার নিজের দিকে, তার নিজের ভাগ্যের দিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, খুব কম লোকই তাদের নিয়তি ও তাদের সুখের জন্য যে পথ রয়েছে, সে পথ অনুসরণ করে। বেশির ভাগ লোক দুনিয়াকে দেখে হুমকিপূর্ণ স্থান হিসেবে। এর কারণ হলো, তাদের কাজের কারণে বিশ্ব বদলে গিয়ে হুমকিপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়ে গেছে।'

'অর্থাৎ আমরা, তাদের হৃদয়গুলো আরো বেশি বেশি কোমলভাবে কথা বলি। আমরা কখনো কথা বলা বন্ধ করি না। তবে আমরা আশা করতে থাকি, আমাদের কথা আর শোনা হবে না : আমরা চাই না লোকজন দুর্ভোগে পড়ুক, কারণ তারা তাদের হৃদয়ের অনুসরণ করবে না।'

'মানুষের হৃদয় কেন তাকে তাদের স্বপ্নের পথে চলা অব্যাহত রাখতে বলে না?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল আলকেমিস্টকে।

'কারণ তাতে হৃদয় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়, হৃদয় কষ্ট পেতে চায় না।'

তারপর থেকে ছেলেটা তার হৃদয়কে বুঝতে পারল। সে তাকে বলল, কখনো যেন সে তার সাথে কথা বলা বন্ধ না করে। সে তাকে বলল, যখন সে তার স্বপ্ন থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, তখন হৃদয় যেনো তাকে চাপ দেয়, তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়। ছেলেটা শপথ করল, যখনই হুঁশিয়ারি শুনবে, বার্তার দিকে সে মনোযোগী হবে।

ওই রাতে সে আলকেমিস্টকে সব কথা জানাল। আর আলকেমিস্ট বুঝতে পারলেন, ছেলেটার হৃদয় জগতের আত্মার কাছে ফিরে গেছে।

'তাহলে এখন আমার কী করা উচিত?' ছেলেটা জানতে চাইল।

'পিরামিডের দিকে পথ চলতে থাকো,' আলকেমিস্ট বললেন। 'আর শুভ-অশুভ লক্ষণের দিকে মনোযোগ দিতে থাকো। তোমার হৃদয় এখনো বলতে সক্ষম, কোথায় তোমার গুপ্তধন আছে।'

'আর এই কি এখনো আমার জানার বাকি থাকা একটি বিষয়?'

'না,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। "এখন তোমার যা জানা প্রয়োজন তা হলো : স্বপ্ন পূরণের আগে জগতের আত্মা পথজুড়ে শেখা প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করে।

এটি মন্দ- এ কারণে এমন করে তা কিন্তু নয়। বরং এজন্য করে, আমাদের স্বপ্ন পূরণ ছাড়াও আমরা স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে যা কিছু শিখেছি, সে সম্পর্কে যাতে দক্ষ হয়ে ওঠি। ঠিক এই পর্যায়েই বেশির ভাগ লোক ছুটে চলা ছেড়ে দেয়। এই অবস্থাকেই আমরা মরুভূমির ভাষায় বলি, 'দিগন্তে খেজুর গাছ দেখা যাওয়ার মুহূর্তেই কেউ পিপাসায় মারা যায়।'"

'প্রতিটি অনুসন্ধান শুরু হয় সূচনাকারীর ভাগ্য দিয়ে। আর প্রতিটি অনুসন্ধান শেষ হয় বিজয়ীকে চরমভাবে পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে।'

ছেলেটার তার দেশের পুরনো একটি প্রবাদবাক্য মনে পড়ল। এতে বলা হয়েছে - রাতের সবচেয়ে অন্ধকারতম সময় হলো ভোর হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটি।

***

পর দিন বিপদের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা গেল। সশস্ত্র তিনটি গোত্রীয় লোক এগিয়ে এলো, তারা ছেলেটা ও আলকেমিস্টকে জিজ্ঞাসা করল, তারা সেখানে কী করছে?

'আমি আমার বাজপাখি নিয়ে শিকার করছি,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন।

'তোমরা সশস্ত্র কি না আমরা তা তল্লাশি করে দেখব,' গোত্রীয় এক লোক বলল।

আলকেমিস্ট ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামলেন, ছেলেটাও একই কাজ করল।

'তুমি সাথে টাকা রেখেছ কেন?' ছেলেটার ব্যাগ তল্লাসি করার পর লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

'পিরামিডে যাওয়ার জন্য আমার এই টাকার দরকার,' সে বলল।

যে গোত্রীয় লোকটি আলকেমিস্টের মালামাল তল্লাশি করছিল, সে তরল পদার্থে ভরা একটি ছোট ক্রিস্টালের ফ্লাস্ক, মুরগির ডিমের চেয়ে সামান্য একটু বড় একটি হলুদ কাচের ডিম পেল।

'এসব কী জিনিস?' সে জানতে চাইল।

'এ হলো পরশ পাথর আর আবে হায়াত, আলকেমিস্টদের সেরা সৃষ্টি। এই আবে হায়াতের এক ফোঁটা কেউ পান করলে সে আর কখনো অসুস্থ হবে না। আর এই পাথরের একটুখানিও যেকোনো পদার্থকে সোনায় পরিণত করতে পারে।

আরবেরা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। আলকেমিস্টও হাসলেন। তারা ভাবল, লোকটির জবাব মজার। ছেলেটা ও আলকেমিস্টকে মালামালসহ তাদের পথে চলতে দিলো তারা।

'আপনি কি পাগল?' একটু দূরে গিয়ে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল আলকেমিস্টকে। 'আপনি এমন কেন করলেন?'

'তোমাকে জীবনের সহজ একটি শিক্ষা দিতে,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'তোমার সাথে অনেক সম্পদ থাকলে সেসবের কথা তুমি সঙ্গীদের বলে দিতে পারো। খুব কম সময়ই তারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে।'

তারা মরুভূমি দিয়ে চলতে থাকলেন। সময় যতই গড়াতে লাগল, ছেলেটার হৃদয় ততই নীরব হতে লাগল। অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোনো কিছুই সে আর জানতে চাইছিল না। সে কেবল গভীর মনোযোগের সাথে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতে, ছেলেটার সাথে জগতের আত্মা থেকে সুধা পান করতে চাইছিল। ছেলেটা ও তার হৃদয় হয়ে গেল বন্ধু। তাদের আর কারোরই একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সামর্থ্য রইল না।

হৃদয় যখন ছেলেটার সাথে কথা বলে, ছেলেটা তাতে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সে শক্তি পায়। কারণ মরুভূমিতে নীরবতার দিনগুলো ক্লান্তিকর। ছেলেটার সবচেয়ে শক্তিশালী গুণ কী কী তা তাকে বলল তার হৃদয় : তার ভেড়ার পাল ত্যাগ করার এবং নিয়তির সন্ধানে বের হয়ে পড়ার সাহস এবং ক্রিস্টাল দোকানে কাজ করার সময় তার উদ্দীপনা।

আর তার হৃদয় তাকে বলল, আরো কিছু আছে, যা ছেলেটা কখনো লক্ষ করেনি। তা হলো ছেলেটার প্রতি যেসব হুমকি এসেছিল, সেগুলো সম্পর্কে তাকে সে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, কিন্তু ছেলেটা সেসব বুঝতে পারেনি। তার হৃদয় বলল, একবার ছেলেটা তার বাবার রাইফেল নিয়েছিল। কিন্তু হৃদয় তা লুকিয়ে ফেলেছিল। কারণ আশঙ্কা ছিল, ছেলেটা হয়তো নিজেকেই আহত করে ফেলবে। সে ছেলেটাকে একবার মাঠে অসুস্থ হয়ে বমি করার কথা মনে করিয়ে দিলো। বমি করার পর ছেলেটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। দূরে দুই চোর অপেক্ষা করছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, তাকে হত্যা করে ভেড়াগুলো নিয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেটাকে আসতে না দেখে তারা ভেবেছিল, ছেলেটা সম্ভবত রাস্তা বদলে ফেলেছে। তখন তারাও আরো এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

'প্রত্যেকের হৃদয় কি সবসময় তাকে সহায়তা করে না?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল আলকেমিস্টকে।

'মূলত যারা তাদের নিয়তিকে পূরণ করার চেষ্টা করতে থাকে, তাদের হৃদয়ই তা করে। তবে তারা শিশু, মদ্যপ ও বয়স্কদেরও সহায়তা করে।'

'এর মানে কি এই, আমি কখনো বিপদে পড়ব না?'

'এর অর্থ হলো, হৃদয় যতটুকু করতে পারে, সে ততটুকুই করে,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন।

এক বিকেলে তারা একটি গোত্রের শিবির অতিক্রম করছিলেন। শিবিরের প্রতিটি কোণে আরবেরা সুন্দর সাদা জোব্বা পরে অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে ছিল। লোকগুলো হুক্কা টানছিল, যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে গল্প বলছিল। কেউ এই দুই মুসাফিরের দিকে নজর দিলো না।

'বিপদ নেই,' ছেলেটা বলল, শিবিরটি অতিক্রম করার পর।

আলকেমিস্ট ক্রুদ্ধভাবে শব্দ করলেন : 'তোমার হৃদয়কে বিশ্বাস করো। তবে কখনো ভুলে যাবে না, তুমি মরুভূমিতে আছ। যখন কেউ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে থাকে, জগতের আত্মা যুদ্ধের চিৎকার শুনতে পায়। কেউই সূর্যের নিচে থাকা কোনো কিছুর পরিণতি ভোগ করা থেকে বাদ পড়ে না।'

সব কিছুই এক, ছেলেটা ভাবল। আর ঠিক তখনই মরুভূমি যেন দেখাতে চাইল, আলকেমিস্টই ঠিক। দুজন ঘোড়সওয়ার মুসাফিরদের দিকে এগিয়ে এলো।

'থামো, তোমরা আর এগুতে পারবে না,' তাদের একজন বলল। 'গোত্রগুলোর যুদ্ধক্ষেত্রে এখন তোমরা।'

'আমি খুব বেশি দূর যাচ্ছি না,' ঘোড়সওয়ারের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। তারা এক মুহূর্ত নীরব রইলেন, তারপর ছেলেটা ও আলকেমিস্টকে চলে যেতে দিতে রাজি হলো।

ছেলেটা বিস্ময়ে এই বিনিময় দেখল। 'আপনি তাদের দিকে তাকিয়েই ওই ঘোড়সওয়াদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন,' ছেলেটা বলল।

'তোমার চোখ তোমার আত্মার শক্তি প্রদর্শন করে,' জবাব দিলেন আলকেমিস্ট।

কথা সত্য, ছেলেটা ভাবল। সে লক্ষ করেছে, পেছনের শিবিরে সশস্ত্র লোকদের মধ্যে একজন ছিল, সে দুজনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল। সে এত দূরে ছিল যে - তার চেহারাও দেখা যাচ্ছিল না। তবে ছেলেটা নিশ্চিত ছিল, সে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

শেষ পর্যন্ত, তারা পুরো দিগন্ত বিস্তৃত পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করে গেল, তখন আলকেমিস্ট বললেন, পিরামিড এখন থেকে দুই দিনের পথ।

'আমরা যদি শিগগিরই আলাদা হয়ে যাই,' ছেলেটা বলল, 'তবে আমাকে আলকেমি সম্পর্কে কিছু শেখান।'

'তুমি ইতোমধ্যেই আলকেমি সম্পর্কে জেনে গেছ। এটি আসলে জগতের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তোমার জন্য রাখা গুপ্তধন আবিষ্কারের বিষয়।'

'না, আমি তা বোঝাতে চাইনি। আমি লোহাকে সোনায় পরিবর্তন করার কথা বলছি।'

আলকেমিস্ট মরুভূমির মতো নীরব হয়ে গেলেন। তিনি খাবার গ্রহণের জন্য থামার পরই কেবল ছেলেটার প্রশ্নের জবাব দিলেন।

'মহাবিশ্বের সবকিছুই বিবর্তিত হয়,' তিনি বললেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য, সোনা হলো এমন ধাতু, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছে। কেন হয়েছে, তা জানতে চেয়ো না; আমি জানি না তা কেন হয়েছে। আমি কেবল এটুকুই জানি, ঐতিহ্য সবসময় সঠিক।

'মানুষ কখনো জ্ঞানীদের কথা বুঝতে পারে না। এ কারণে সোনা বিবর্তনের প্রতীক না হয়ে সজ্ঘাতের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।'

'পদার্থ নানা ভাষায় কথা বলে,' ছেলেটা বলল। 'একসময় উটের ডাক উটের গোঙানির চেয়ে বেশি কিছু মনে হতো না। কিন্তু তারপর মনে হলো বিপদ-সঙ্কেত। আর শেষ পর্যন্ত আবার তা গোঙানিই পরিণত হয়েছে।

কিন্তু সে তারপর থেমে গেল। আলকেমিস্ট সম্ভবত ইতোমধ্যেই তা জেনে গেছেন।

'আমি সত্যিকারের আলকেমিস্টদের জানি,' আলকেমিস্ট বলে চললেন। 'তারা নিজদেরকে গবেষণাকারে আবদ্ধ করে রেখে সোনার মতো নিজেদের বিবর্তিত করেন। তারা খুঁজে পান পরশ পাথর। কারণ তারা বোঝেন, যখন কোনো কিছু বিবর্তিত হয়, তখন ওই জিনিসের আশপাশের সবকিছুও বদলে যেতে থাকে।

'কেউ কেউ কাকতালীয়ভাবে পাথর পেয়ে যায়। তাদের কাছে আগে থেকেই উপহারটি থাকে। আর অন্যদের আত্মার চেয়ে তাদের আত্মা এ ধরনের জিনিসের জন্য অনেক বেশি প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে তারা গ্রাহ্য করে না। তারা বেশ বিরল।

'আর তারপর আসে অন্যদের কথা, তাদের আগ্রহ কেবল সোনায়। তারা কখনো রহস্য উন্মোচন করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে সীসা, তামা আর লোহা সবাই তাদের নিজ নিজ নিয়তিকে পূর্ণ করে। আর কেউ অন্যদের নিয়তিতে হস্তক্ষেপ করলে তার নিজের নিয়তি কখনো আবিষ্কার করতে পারে না।'

আলকেমিস্টের কথাগুলো অভিশাপের মতো মনে হলো। তিনি কথা বলতে বলতে মাটি থেকে একটি ঝিনুকের খোল কুড়িয়ে নিলেন।

'এই মরুভূমি একসময় ছিল সাগর,' তিনি বললেন।

'আমি লক্ষ করেছি তা,' ছেলেটা জবাব দিলো।

আলকেমিস্ট ছেলেটাকে তার কানের কাছে খোলটি রাখতে বললেন। সে ছোটবেলায় এমন কাজ অনেকবার করেছে, সাগরের শব্দ শুনেছে।

'সাগর এই খোলে বেঁচে আছে, কারণ এটিই এর নিয়তি। আর এই কাজ করা ছেড়ে দেবে না, যতক্ষণ না আবার মরুভূমি ঢেকে যাবে পানিতে।

তারা আবার ঘোড়ায় চড়লেন, মিসরের পিরামিডের পথে চলতে লাগলেন।

***

ছেলেটার হৃদয় যখন বিপদ-সঙ্কেত দিলো, তখন সূর্য ডুবছিল তাদের চারপাশ ঘিরে ছিল বিশাল বিশাল বালিয়াড়ি। ছেলেটা আলকেমিস্টের দিকে তাকাল, বুঝতে চেষ্টা করল, তিনি কিছু টের পেয়েছেন কি-না। কিন্তু মনে হলো, তিনি কোনো বিপদ সম্পর্কে সচেতন নন। পাঁচ মিনিট পর ছেলেটা দেখতে পেল, দুই ঘোড়সওয়ার তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে আলকেমিস্টকে কিছু বলার আগেই দুই ঘোড়সওয়ার হয়ে গেল ১০, এরপর ১০০। তারপর বালিয়াড়ির চার দিকে।

তারা নীল পোশাক, পাগড়িতে কালো চাকতি পরা গোত্রীয় লোকজন। তাদের মুখ নীল আবরণে ঢাকা, কেবল চোখ দুটিই দেখা যাচ্ছে।

দূর থেকেও তাদের চোখগুলো তাদের আত্মার শক্তি প্রকাশ করছিল। আর তাদের চোখগুলো বলছিল মৃত্যুর কথা।

***

তাদের দু'জনকে কাছের সামরিক ক্যাম্পে নেওয়া হলো। এক সৈনিক ছেলেটা আর আলকেমিস্টকে ধাক্কা দিয়ে একটি তাঁবুর ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। সর্দার সেখানে তার স্টাফদের সাথে বৈঠক করছিলেন।

'এরা হলো গুপ্তচর,' একজন বলল।

'আমরা স্রেফ মুসাফির,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন।

'তোমাদেরকে তিন দিন আগে শত্রুর ক্যাম্পে দেখা গেছে। আর তুমি সেখানে এক সৈন্যের সাথে কথা বলেছিলে।'

'আমি স্রেফ মুসাফির মানুষ, আমি আকাশের তারা চিনি,' আলকেমিস্ট বললেন। 'সৈন্য বা গোত্রদের চলাচল সম্পর্কে আমার কাছে কোনো খবর নেই। আমি এখানে কেবল আমার বন্ধুর রাহাবার হিসেবে কাজ করছি।'

'তোমার বন্ধু ছেলেটি কে?' সর্দার জানতে চাইলেন।

'আলকেমিস্ট,' বললেন আলকেমিস্ট। 'তিনি প্রকৃতির শক্তি বোঝেন। আর তিনি তার অবিশ্বাস্য শক্তি আপনাকে দেখাতে চান।'

ছেলেটা চুপ করে শুনল। ভয়ও পেল।

'একজন বিদেশি এখানে কী করছে?' আরেকজন জিজ্ঞাসা করল।

'তিনি আপনার গোত্রকে দেওয়ার জন্য অর্থ নিয়ে এসেছেন,' আলকেমিস্ট বললেন, ছেলেটা কিছু বলার আগেই। ছেলেটার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে আলকেমিস্ট স্বর্ণমুদ্রাগুলো সর্দারকে দিয়ে দিলেন।

আরব সর্দারটি কোনো কথা না বলে সেগুলো গ্রহণ করলেন। এই অর্থ দিয়ে অনেক অস্ত্র কেনা যাবে।

'আলকেমিস্ট কী?' অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন।

'এমন এক ধরনের মানুষ, যারা প্রকৃতি ও বিশ্বকে বোঝেন। তিনি চাইলে কেবল বাতাসের শক্তি দিয়েই এই ক্যাম্প ধ্বংস করে দিতে পারেন।'

লোকটি হাসলেন। তারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত। আর জানেন, বাতাস তাদের ওপর প্রাণঘাতী আঘাত হানতে পারে না। অবশ্য তবুও প্রত্যেকে অনুভব করলেন, তাদের হৃদকম্পন বেড়ে গেছে। তারা মরুভূমির মানুষ, তারা জাদুটোনাকারীদের ব্যাপারে ভীত।

'আমি চাই, সে তা করে দেখাক,' বললেন সর্দার।

'তার দরকার তিন দিন,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'তিনি নিজেকে বাতাসে রূপান্তরিত করতে যাচ্ছেন, স্রেফ তার শক্তি দেখানোর জন্য। তিনি যদি তা না করতে পারেন, তবে আমরা বিনীতভাবে আমাদের জীবন আপনাদের দিয়ে দেবো, আপনার গোত্রের সম্মানের জন্য।'

'আমার অধিকারে এসে গেছে, এমন কিছু তো আপনি আর আমাকে দিতে পারেন না,' সর্দার বললেন, উদ্ধতভাবে। তবে তিনি মুসাফিরদের তিন দিন সময় দিলেন।

ছেলেটা ভয়ে কাঁপছিল। আলকেমিস্ট তাকে তাঁবুর ভেতর থেকে বের করে আনলেন।

'তুমি যে ভয় পাচ্ছো, তা তাদের বুঝতে দিও না,' আলকেমিস্ট বললেন। 'তারা সাহসী মানুষ, তারা ভীরুদের ঘৃণা করে।'

তবে ছেলেটা কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না। তারা ক্যাম্পের মধ্যভাগ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার পরই কেবল ছেলেটার মুখ দিয়ে শব্দ বের হতে পারল। তাদেরকে কারারুদ্ধ করার কোনো দরকার ছিল না : আরবেরা কেবল তাদের ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করেই ক্ষান্ত থেকেছে। আর এর মাধ্যমে দুনিয়া আবার তার অনেক ভাষা প্রকাশ করল : যে মরুভূমি মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল সীমাহীন আর স্বাধীন। আর এখন তা অভেদ্য প্রাচীর।

'আমার যা ছিল, সবই আপনি তাদের দিয়ে দিয়েছেন,' ছেলেটা বলল। 'আমার পুরো জীবনে যা জমিয়েছিলাম, একেবারে সবই!'

'আচ্ছা, বলো তো তোমাকে যদি মরে যেতে হয়, এই সম্পদ দিয়ে তোমার কী হবে?' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'তোমার টাকা আমাদের তিন দিনের জন্য রক্ষা করেছে। সবসময় অর্থ মানুষের জীবন বাঁচায় না।'

এ ধরনের জ্ঞানের কথা শোনার মতো অবস্থা তার তখন ছিল না। সে তখন ভয়াবহ রকমের আতঙ্কিত। কিভাবে নিজেকে বাতাসে রূপান্তরিত করা যাবে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তার। সে তো আর আলকেমিস্ট নয়!

আলকেমিস্ট এক সৈন্যকে একটু চা আনতে বললেন। তিনি তা ছেলেটার কব্জিতে ঢেলে দিলেন। ছেলেটার মধ্য দিয়ে স্বস্তির প্রবাহ বয়ে গেল। আলকেমিস্ট কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, ছেলেটা এর কিছুই বুঝতে পারল না।

'ভয় প্রকাশ করবে না,' আলকেমিস্ট বললেন, অবাক করা শান্ত কণ্ঠে। 'তুমি তা করলে তোমার হৃদয়ের সাথে কথা বলতে পারবে না।'

'কিন্তু নিজেকে কিভাবে বাতাসে পরিণত করব, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই তো আমার নেই।'

'কোনো লোক যখন তার নিয়তির দিকে ছোটে, সে তার প্রয়োজনের সবকিছুই জানে। মাত্র একটি জিনিসই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার কাজ অসম্ভব করে তোলে। সেটি হলো ব্যর্থতার ভয়।'

'আমি ব্যর্থ হতে ভয় পাই না। আমি কেবল জানি না, নিজেকে কিভাবে বাতাসে রূপান্তরিত করতে হয়।'

'ঠিক আছে, তোমাকে শিখতে হবে; এর ওপর নির্ভর করছে তোমার জীবন।'

'কিন্তু আমি না পারলে কী হবে?'

'তাহলে তুমি তোমার নিয়তির দিকে ছোটার চেষ্টারত অবস্থায় মারা যাবে। তা আরো কোটি কোটি লোকের মৃত্যুর চেয়ে ভালো, যারা তাদের নিয়তি কী তা পর্যন্ত জানে না।

'তবে চিন্তিত হবে না.' আলকেমিস্ট বলে চললেন। 'সাধারণত মৃত্যুর হুমকি মানুষজনের মধ্যে তাদের জীবন সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টি করে।'

***

প্রথম দিন চলে গেল। কাছাকাছি একটি বড় যুদ্ধ হচ্ছে। বেশ কয়েকজন আহতকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। মৃত সৈন্যদের স্থান পূরণ করল অন্যরা। জীবন চলতে থাকল। মৃত্যু কোনো কিছু বদলায় না, ছেলেটা ভাবল।

'তুমি পরেও মারা যেতে পারতে,' এক সৈন্য তার নিহত সঙ্গীর লাশের দিকে তাকিয়ে বলল। 'শান্তি ঘোষণার পরও তোমার মৃত্যু আসতে পারত। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, তোমাকে মরতেই হতো।'

দিনের শেষে ছেলেটা আলকেমিস্টের দিকে তাকাল। তিনি তার বাজপাখিটিকে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

'আমি এখনো বুঝতে পারছি না, কিভাবে নিজেকে বাতাসে পরিণত করব,' ছেলেটা আবার বলল।

'মনে করে দেখো, আমি তোমাকে কী বলেছিলাম : দুনিয়া হলো ঈশ্বরের একমাত্র দৃশ্যমান অবস্থা। আর আলকেমি আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতাকে বস্তুগত অস্তিত্বের সংস্পর্শে আনার কাজই করে।'

'আপনি কী করছেন?'

'আমার বাজপাখিকে খাওয়াচ্ছি।'

'যদি আমি নিজেকে বাতাসে পরিণত করতে না পারি, তবে আমরা মারা যাব,' ছেলেটা বলল। 'তা হলে, আপনি বাজপাখিকে খাওয়াচ্ছেন কেন?'

'এখানে একমাত্র তুমিই হয়তো মারা যাবে,' আলকেমিস্ট বললেন। 'আমি আগে থেকেই জানি, কিভাবে নিজেকে বাতাসে পরিণত করতে হয়।'

***

দ্বিতীয় দিনে ছেলেটা ক্যাম্পের কাছে থাকা খাড়া শৃঙ্গে উঠল। পাহারাদারেরা কোনো ধরনের বাধা দিলো না। তারা ইতোমধ্যেই বাতাসকে নিয়ন্ত্রণের শক্তিসম্পন্ন একজন জাদুকরের কথা শুনে ফেলেছে। ফলে তারা তার কাছে যেতে চাইল না। তাছাড়া মরুভূমি কোনোভাবেই অতিক্রম করা যায় না।

সে দ্বিতীয় দিনের সারাটি বিকেল মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থাকল, তার হৃদয়ের কথা শুনল। ছেলেটা জানত, তার ভয় পাওয়ার বিষয়টি মরুভূমি অনুভব করছে।

তারা দুজনই একই ভাষায় কথা বলে।

***

তৃতীয় দিনে সর্দার সভা করলেন তার কর্মকর্তাদের সাথে। তিনি সভায় আলকেমিস্টকে ডেকে বললেন, 'বাতাসের গতি বদলে দিতে পারা ছেলেটাকে তা করে দেখাতে বলুন।'

'ঠিক আছে,' বললেন আলকেমিস্ট।

ছেলেটা তাদের সবাইকে শৃঙ্গে নিয়ে গেল। আগের দিন সে সেখানেই ছিল। সে সবাইকে বসতে বলল।

'আমি কিছুটা সময় নেব,' ছেলেটা বলল।

'আমাদের কোনো তাড়াহুড়া নেই,' সর্দার জবাব দিলেন। 'আমরা মরুভূমির মানুষ।'

ছেলেটা দিগন্তের দিকে তাকাল। অনেক দূরে পাহাড়-পর্বত দেখা যাচ্ছিল। আর ছিল বালিয়াড়ি, পাথর আর গাছপালা। এমন কঠিন পরিবেশে বাঁচা অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু তবুও তারা বেঁচে আছে। সে কয়েক মাস মরুভূমির ওপর ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু তবুও সে এর সামান্য অংশ মাত্র চিনতে পেরেছে। ওই ছোট অংশে সে ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় ঘটেছে, কাফেলার সাথে চলেছে, গোত্রীয় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে, ৫০ হাজার খেজুর গাছ আর ৩০০ কূপ থাকা মরুদ্যান দেখেছে।

'আজ এখানে তুমি কী চাও?' মরুভূমি তাকে জিজ্ঞাসা করল। 'আমাকে গতকাল কি ভালোভাবে দেখোনি?'

'তুমি আমার ভালোবাসার মানুষটিকে কোনো এক স্থানে ধরে রেখেছ,' ছেলেটা বলল। 'তাই আমি তোমার বালুর উপর তাকালে তাকেও খুঁজি। আমি তার কাছে ফিরে যেতে চাই। আমি নিজেকে যাতে বাতাসে পরিণত করতে পারি, সেজন্য তোমার সহায়তা চাই।'

'ভালোবাসা কী? জিজ্ঞাসা করল মরুভূমি।

'ভালোবাসা হলো তোমার বালির উপর দিয়ে বাজপাখির উড়া। তার কারণেই তুমি সবুজ জমি। তোমার কাছ থেকেই সে সবসময় শিকার নিয়ে ফেরে। সে তোমার পাথর চেনে, তোমার বালিয়াড়ি চেনে, তোমার পাহাড় চেনে। আর তুমি তার প্রতি উদার।'

'বাজপাখির ঠোঁট আমাকে, আমারো কিছুটা বয়ে নিয়ে যায়,' বলল মরুভূমি। 'বছরের পর বছর ধরে, আমি তার শিকারের যত্ন নেই, আমার কাছে থাকা সামান্য

পানি তাকে খাওয়াই, তারপর দেখিয়ে দেই, কোথায় শিকার আছে। তারপর একদিন দেখি, দেখতে পেয়ে খুশি হই, তার শিকার আমার উপরিভাগে বেশ বেড়ে ওঠেছে। বাজপাখি আকাশ থেকে নেমে আসে, আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা নিয়ে যায়।'

'কিন্তু তুমি এ কারণেই শিকার সৃষ্টি করে যাচ্ছ,' ছেলেটা জবাব দেয়। 'শিকার যাতে বাজপাখিকে পরিপুষ্ট করতে পারে। আর বাজপাখি পরিপুষ্ট করতে পারে মানুষকে। আর শেষ পর্যন্ত মানুষ পরিপুষ্ট করে তোমার বালুকে, সেখানেই আবারো শিকার সমৃদ্ধ হয়। এভাবেই বিশ্ব এগিয়ে চলে।'

'তা হলে এই ভালোবাসা?

'হ্যাঁ, এই হলো ভালোবাসা। ভালোবাসাই শিকারকে পরিণত করে বাজপাখি, বাজপাখি পরিণত হয় মানুষে, আর এরপর মানুষ হয়ে যায় মরুভূমি। এটাই লোহাকে পরিণত করে সোনায়, আবার সোনা ফিরে যায় মাটিতে।'

'তুমি কী সব বলছ, আমি বুঝতে পারছি না,' মরুভূমি বলল।

'কিন্তু তুমি অন্তত এটুকু বুঝতে পারছ, তোমার বালুকাভূমির কোনো এক স্থানে এক নারী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর এ কারণেই নিজেকে আমার বাতাসে পরিণত করতে হবে।'

মরুভূমি কয়েক মুহূর্ত কোনো জবাব দিলো না।

তারপর সে তাকে বলল, 'আমি তোমাকে আমার বালি দেবো উড়াতে, তবে একাকী আমি কোনো কিছুই করতে পারি না। তোমাকে বাতাসের সাহায্য চাইতে হবে।'

হালকা বাতাস বইতে শুরু করল। গোত্রীয় লোকজন দূর থেকে ছেলেটাকে দেখছিল। তারা এমন এক ভাষায় কথা বলছিল, যা ছেলেটা বুঝতে পারছিল না।

আলকেমিস্ট হাসলেন।

বাতাস ছেলেটার কাছে এলো, তার মুখ স্পর্শ করল। মরুভূমির সাথে ছেলেটার কথাবার্তার ব্যাপার সে জানত। তার কোনো জন্মস্থান নেই, মৃত্যুর জায়গাও নেই। কিন্তু সে সারা দুনিয়ায় প্রবাহিত হয়।

'আমাকে সাহায্য করো,' ছেলেটা বলল। 'একদিন তুমি আমার প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর আমার কাছে বয়ে এনেছিলে।'

'কে তোমাকে মরুভূমি আর বাতাসের ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছে?'

'আমার হৃদয়,' ছেলেটার জবাব।

বাতাসের অনেক নাম আছে। পৃথিবীর কোনো এক স্থানে একে বলে সিরোকো, কারণ সে মহাসাগরের আর্দ্রতা পূর্ব দিকে বয়ে আনে। দূরের যে স্থান থেকে ছেলেটা এসেছে, সেখানে বলে লেভেন্টার, কারণ সেখানে বিশ্বাস করা হয়, বাতাস সেখানে মরুভূমির বালি আর মুরিশ যুদ্ধের আর্তনাদ নিয়ে আসে। হয়তো যেখানে তার ভেড়াগুলো চড়ত, তারও দূরে মানুষ মনে করে, বাতাস আসে

আন্দালুসিয়া থেকে। তবে আসলে বাতাসের সত্যিকার অর্থে কোনো স্থান নেই, তার যাওয়ার মতো কোনো জায়গাও নেই। আর এ কারণেই সে মরুভূমির চেয়েও শক্তিশালী। কেউ হয়তো কোনো একদিন মরুভূমিতে গাছ লাগাতে পারে, কিংবা সেখানে ভেড়া পালন করতে পারে, কিন্তু তারা কখনো বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

'তুমি বাতাস হতে পারো না,' বাতাস বলল। 'আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জিনিস।'

'কথাটি সত্য নয়,' ছেলেটা বলল। 'আমি সফরের সময় আলকেমিস্টের কাছ থেকে অনেক গোপন তত্ত্ব শিখেছি। আমার মধ্যে বাতাস আছে, মরুভূমি আছে, মহাসাগর আছে, তারকা আছে, মহাবিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সবকিছু আছে। আমরা সবাই একই হাতে সৃষ্ট হয়েছি, আমাদের সবার আত্মা একই। আমি তোমার মতো হতে চাই, পৃথিবীর সব কোণায় পৌছার সক্ষমতা চাই, সাগর পাড়ি দিতে চাই, আমার গুপ্তধন ঢেকে রাখা বালিয়াড়িকে উপড়ে ফেলতে চাই, আমার ভালোবাসার নারীর কণ্ঠস্বর বহন করতে চাই।'

'সে দিন তুমি আলকেমিস্টের সাথে কী কথা বলেছ, আমি শুনেছি,' বাতাস বলল। 'তিনি বলেছেন, সবকিছুরই নিজস্ব নিয়তি আছে। কিন্তু মানুষ নিজেদের বাতাসে পরিণত করতে পারে না।'

'মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে বাতাসে পরিণত হওয়ার শিক্ষা দাও,' ছেলেটা বলল। 'তুমি আর আমি তাহলে মানুষ আর বাতাসের সীমাহীন সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে পারি।'

বাতাসের কৌতূহল সৃষ্টি হলো, এমন কথা আগে কখনোই হয়নি। সে এসব নিয়ে কথা বলতে চাইল। কোনো মানুষকে কিভাবে বাতাসে পরিণত যায়, তা ভেবে পাচ্ছিল না বাতাস। অথচ বাতাস কত কাজই না করতে পারে! সে মরুভূমি তৈরি করতে পারে, জাহাজ ডোবাতে পারে, পুরো বনভূমি উজাড় করে দিতে পারে, সঙ্গীত আর অদ্ভুত শব্দে পরিপূর্ণ একের পর এক নগরী দিয়ে ছুটে চলতে পারে। এত দিন তার মনে হতো, তার কোনো সীমা নেই। কিন্তু এখন এ ছেলেটা বলছে, আরো অনেক কাজ আছে যা বাতাসের করতে পারা উচিত।

'আমরা একেই বলি ভালোবাসা,' ছেলেটা বলল। এখন সে বুঝতে পেরেছে, সে যে অনুরোধ করেছে, বাতাস তা অনুমোদন করার কাছাকাছি অবস্থায় রয়েছে। 'তুমি যখন ভালোবাসবে, তুমি তখন যেকোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। তুমি যখন ভালোবাসবে, তখন কী ঘটছে, তা বোঝার কোনো দরকার নেই। কারণ তোমার মধ্যে সবকিছুই ঘটছে, এমনকি মানুষও নিজেকে বাতাসে পরিণত করতে পারে। তবে যতক্ষণ বাতাস তাকে সাহায্য করবে।'

বাতাস গর্বিত সত্তা, ছেলেটার কথায় উত্তেজিত হচ্ছিল। সে আরো জোরে প্রবাহিত হতে শুরু করল, মরুভূমির বালি উড়াতে লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে

স্বীকার করতে হলো, সে সারা পৃথিবীতে চষে বেড়ালেও সে জানে না কিভাবে কোনো মানুষকে বাতাসে পরিণত করতে হয়। আর সে ভালোবাসা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

'বিশ্বজুড়ে আমার সফরে আমি প্রায়ই লোকজনকে ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতে শুনেছি, আকাশের দিকে তাকাতে দেখেছি,' বাতাস বলল। তবে তার কণ্ঠে এখন নিজের সীমাবদ্ধতার স্বীকারোক্তি নিয়ে ক্ষোভ। 'হয়তো আকাশের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে অনেক ভালো।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমাকে তা করতে সাহায্য করো,' ছেলেটা বলল। 'এ স্থান বালিঝড়ে ভরে দাও, যাতে তা সূর্যকে শুষে শেষ করে দেয়। তারপর নিজেকে অন্ধ না করে আমি যেন আকাশের দিকে তাকাতে পারি।'

তখন বাতাস তার সব শক্তি দিয়ে বইতে শুরু করল, আকাশ বালিতে ঢেকে গেল। সূর্য পরিণত হলো সোনালি চাকতিতে।

ক্যাম্পে কিছু দেখতে পাওয়া হয়ে পড়ল কঠিন। মরুভূমির লোকজন আগে থেকেই এসব দেখে অভ্যস্ত ছিল। তারা একে বলে *সাইমুম*। এই ঝড় সাগরের ঝড়ের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। এতে তাদের ঘোড়াগুলো চিৎকার করতে থাকল, তাদের সব অস্ত্র বালিতে ঢেকে গেল।

প্রবলতম ঝড়ের সময় এক কমান্ডার তাদের সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, 'এই ঝড় এখন থামানোই হয়তো আমাদের জন্য মঙ্গল হবে।'

তারা ছেলেটাকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছিল না। তাদের মুখ নীল কাপড়ে ঢাকা, চোখে ভয়।

'ঝড় থামাতে বলুন,' আরেক কমান্ডার বললেন।

'আমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে চাই,' সর্দার বললেন, শ্রদ্ধার সাথে। 'আমি দেখতে চাই, কিভাবে কোনো মানুষ নিজেকে বাতাসে পরিণত করে।'

তবে যে দুই কমান্ডার তাদের ভয় পাওয়ার কথা প্রকাশ করেছে, তিনি মনে মনে তাদের নাম টুকে রাখলেন। বাতাস থামা মাত্র তিনি তাদের কমান্ড থেকে খারিজ করে দেবেন। কারণ মরুভূমির আসল মানুষরা তো কখনো ভয় পায় না।

'বাতাস আমাকে বলল, তুমি জানো ভালোবাসা কারে কয়', সূর্যকে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটা। 'তুমি যদি ভালোবাসা সম্পর্কে জেনে থাকো, তবে অবশ্যই জগতের আত্মা সম্পর্কেও জানো। কারণ এটি ভালোবাসা দিয়ে তৈরি।'

'যেখানে আছি, সেখান থেকেই আমি জগতের আত্মাকে দেখতে পাই,' সূর্য বলল। 'এটি আমার আত্মার সাথে কথা বলে। আমরা দুইয়ে মিলে গাছপালা জন্মাতে দেই, ভেড়ার পালকে ছায়া দেই। আমি যেখানে আছি, সেখান থেকেই কাজটি করি। আর আমি তো দুনিয়া থেকে অনেক দূরে থেকেও শিখেছি ভালোবাসা কী। আমি জানি, আমি দুনিয়ার দিকে একটুও কাছে এগোলে, তবে দুনিয়া মরে যাবে, জগতের আত্মার অস্তিত্ব থাকবে না। এ কারণে আমরা একে অপরের কথা

ভাবি। আমরা একে অপরকে চাই, তাকে দেই জীবন আর উষ্ণতা, সে আমাকে দেয় বেঁচে থাকার যৌক্তিকতা।'

'অর্থাৎ তুমি ভালোবাসা সম্পর্কে জানো,' ছেলেটা বলল।

'আর আমি জানি জগতের আত্মাকে। কারণ আমরা মহাবিশ্বের অনন্ত পরিক্রমার সময় একে অপরের সাথে কথা বলি। সে আমাকে বলে, তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এখন পর্যন্ত, কেবল খনিজ আর উদ্ভিদই বোঝে, সবকিছুই এক। এ কারণেই তারা মনে করে, লোহার দরকার নেই তামার মতো হওয়ার, কিংবা তামার প্রয়োজন নেই সোনা হওয়ার। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে তার দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। প্রতিটি জিনিসই শান্তির সাথে থাকত, যদি এসব কিছু যে হাত লিখেছে, সে সৃষ্টির পঞ্চম দিনে থেমে যেত।'

'কিন্তু একটি ষষ্ঠ দিন ছিলই,' সূর্য বলে চলে।

'তুমি জ্ঞানী। কারণ তুমি দূর থেকে সবকিছু দেখছ,' ছেলেটা বলল। 'তবে তুমি ভালোবাসা কী তা জানো না। ষষ্ঠ দিন না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব থাকত না; তামা সবসময় তামাই থেকে যেত, সীসা রয়ে যেত সীসাই। সবারই একটি নিয়তি আছে। এ হলে অমোঘ সত্য কথা। একদিন সব নিয়তি পূরণও হবে। ফলে প্রতিটি জিনিসকেই আরো ভালো কিছুতে, কোনো একদিন একটি নতুন নিয়তি তথা জগতের আত্মা মাত্র একটি জিনিসে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে রূপান্তরিত করতে হয়।'

সূর্য এ নিয়ে ভাবল। তারপর আরো উজ্জ্বলভাবে আলো ফেলার সিদ্ধান্ত নিলো। বাতাস এতক্ষণ তাদের কথাবার্তা উপভোগ করছিল। এখন আরো জোরে বইতে শুরু করল, যাতে ছেলেটাকে অন্ধ করে না দিতে পারে সূর্য।

'এ কারণেই আলকেমি অস্তিত্বশীল,' ছেলেটা বলল। 'যাতে প্রত্যেকেই তার গুপ্তধনের অনুসন্ধান করে, তা পায়, এবং তারপর আগের যে জীবনে সে ছিল, তার চেয়ে ভালো হতে চায়। পৃথিবীর লোহার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত লোহা তার ভূমিকা পালন করে যাবে; তারপর লোহা রূপান্তরিত হবে সোনায়।

'আলকেমিস্টরা ঠিক এই কাজই করেন। তারা জানেন, আমরা যখন বর্তমান অবস্থা থেকে ভালো হওয়ার সংগ্রাম করি, তখন আমাদের আশপাশের সবাইও আরো ভালো হয়ে পড়ে।'

'ঠিক আছে, তুমি কেন বললে, আমি ভালোবাসা কী জানি না?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল ছেলেটাকে।

'কারণ মরুভূমির মতো স্থির হয়ে থাকা ভালোবাসা নয়, কিংবা বাতাসের মতো ঘুরতে থাকাও ভালোবাসা নয়। তোমার মতো দূর থেকে সবকিছু দেখাও ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা এমন এক শক্তি যা জগতের আত্মাকে রূপান্তরিত করে, উন্নত করে। আমি যখন প্রথম এই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, জগতের আত্মা নিখুঁত। কিন্তু পরে আমি দেখতে পেলাম, এটি অন্যসব সৃষ্টির

মতোই, তার নিজেরও আবেগ, যুদ্ধ রয়েছে। আমরা যারা জগতের আত্মাকে পরিপুষ্ট করি এবং এই দুনিয়ায় বাস করি, সেটি আরো ভালো বা খারাপ হওয়া নির্ভর করে আমরা নিজেরা ভালো বা খারাপ কি-না তার ওপর। আর এখানেই ভালোবাসার শক্তির কথা আসে। কারণ আমরা যখন ভালোবাসি, তখন আমরা সবসময় বর্তমানের চেয়ে আরো ভালো হওয়ার সংগ্রাম করি।'

'আচ্ছা, তুমি আমার কাছে কী চাও?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।

'আমি চাই, তুমি আমাকে বাতাসে পরিণত হতে সাহায্য করবে,' ছেলেটা জবাব দিলো।

'প্রকৃতি মনে করে, আমি হলাম সৃষ্টির সবচেয়ে জ্ঞানী,' সূর্য বলল। 'কিন্তু আমি জানি না, কিভাবে তোমাকে বাতাসে রূপান্তরিত করা যায়।'

'তাহলে কাকে জিজ্ঞাসা করব?'

সূর্য এক মিনিট চিন্তা করল। বাতাস খুব কাছ থেকে শুনছিল। সে পৃথিবীর সব কোণায় সূর্যের বিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধতার কথা বলে দিলো। সে বলে দিলো, পৃথিবীর ভাষায় কথা বলা ছেলেটার কথামতো কাজ করতে পারেনি সূর্য।

'সবকিছু লিখেছে যে হাত, তার সাথে কথা বলো,' সূর্য বলল।

বাতাস আনন্দে চিৎকার করে ওঠল, আরো জোরে বইতে শুরু করল। তাঁবুগুলো দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে গেল। প্রাণীগুলো খুঁটি উপড়ে পালিয়ে গেল। শৃঙ্গের উপরে লোকজন উড়ে যেতে পারে ভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

সবকিছু লেখে যে হাত, ছেলেটা তাতে রূপান্তরিত হলো। এমন করে তার মনে হলো, মহাবিশ্ব নীরব-নিথর হয়ে গেছে, সে কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিলো।

ভালোবাসার স্রোত তার হৃদয় দিয়ে বয়ে গেল। ছেলেটা প্রার্থনা করতে শুরু করল। এটি এমন এক প্রার্থনা, যা সে কখনো করেনি। এই প্রার্থনা কোনো শব্দ ছিল না, না ছিল কিছু চাওয়ার আবেদন। ভেড়াগুলো নতুন প্রান্তর পেয়েছে বলে শুকরিয়া জানানোর জন্যও এ প্রার্থনা করছিল না; ছেলেটা যাতে আরো বেশি ক্রিস্টাল বিক্রি করতে পারে, এমন কামনাও প্রার্থনায় ছিল না; তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করে থাকা নারীর সাথে সাক্ষাতের মিনতিও ছিল না এতে। নীরবে ছেলেটা বুঝতে পারল - মরুভূমি, বাতাস, সূর্যও হাতটির লেখা সঙ্কেত বোঝার চেষ্টা করছে, তারা সবাই তাদের পথ অনুসরণ করছে, একটি মাত্র পান্নায় যা লেখা রয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করছে। সে দেখল, শুভ-অশুভ ইঙ্গিতগুলো সারা দুনিয়ায় এবং সেইসাথে মহাকাশেও ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে তাদের দেখা যাওয়ার কারণের কিংবা তাৎপর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরকার নেই। মরুভূমি নয়, বাতাস নয়, সূর্য নয়, লোকজন নয় - কেউ জানে না, কেন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এর সবকিছুর সৃষ্টির জন্য হাতটির একটি যুক্তি রয়েছে। কেবল এ হাতই অলৌকিক কিছু করতে পারে। সে সাগরকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করতে পারে... কিংবা মানুষকে বাতাসে

পরিণত করতে পারে। কারণ কেবল হাতটিই বোঝে, মহাবিশ্বকে গতিশীল করে সৃষ্টির ছয় দিনের এক পরিকল্পনার আলোকে সর্বোত্তম পর্যায়ে বিবর্তিত করা হয়েছিল।

ছেলেটা জগতের আত্মায় পৌঁছে গেল, দেখতে পেল, এ হলো ঈশ্বরের আত্মার অংশবিশেষ। আর ছেলেটা দেখল, ঈশ্বরের আত্মা হলো তার নিজেরই আত্মা। আর ওই কারণে ছেলেটাও অলৌকিক কাজ করতে পারল।

***

ওই দিন যে *সাইমুম* বয়ে গেল, তেমন কিছু আগে আর কখনো হয়নি। এর পর কয়েক প্রজন্ম ধরে আরবেরা এক ছেলের কিংবদন্তি স্মরণ করত, যে নিজেকে বাতাসে রূপান্তরিত করেছিল, মরুভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী এক সর্দারের দম্ভ গুঁড়িয়ে একটি সামরিক ক্যাম্প প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিল।

সাইমুম থামলে সবাই ছেলেটা যেখানে বসা আছে সেখানে তাকাল। সে কিন্তু তখন আর সেখানে ছিল না। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে বালিচাপা পড়া এক প্রহরীর পাশে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

তার জাদুতে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তবে সেখানে থাকা মাত্র দুজন হাসছিল : আলকেমিস্ট, কারণ তিনি তার নিখুঁত ছাত্র পেয়েছিলেন এবং সর্দার, কারণ ছাত্রটি আল্লাহর মহিমা বুঝতে পেরেছে।

পর দিন জেনারেল ওই ছেলে ও আলকেমিস্টকে বিদায় জানালেন। তারা যতটুকু চান, তত দূর পর্যন্ত তাদের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

***

তারা পুরো দিন ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। বিকেলের দিকে তারা এক কপ্টিক মঠে পৌঁছলেন। আলকেমিস্ট ঘোড়া থেকে নামলেন। তিনি তাদের পাহারায় থাকা গোত্রীয় লোকজনকে তাদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে বললেন।

'এখন থেকে তুমি একাকী যাবে,' আলকেমিস্ট বললেন। 'তুমি পিরামিড থেকে মাত্র তিন ঘণ্টা দূরে আছ।'

'ধন্যবাদ,' ছেলেটা বলল। 'আপনি আমাকে জগতের ভাষা শিখিয়েছেন।'

'তুমি যা আগেই জানতে, আমি কেবল জাগিয়ে তুলেছি।'

আলকেমিস্ট মঠের দরজায় টোকা দিলেন। কালো পোশাক পরা এক লোক দরজায় এলেন। তারা কপ্টিক ভাষায় কথা বললেন। তারপর আলকেমিস্ট আর ছেলেটাকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানালেন।

'আমি তাকে কিছুক্ষণের জন্য রান্নাঘরটি আমায় ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছি,' আলকেমিস্ট হেসে বললেন।

তারা মঠের পেছনে থাকা রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। আলকেমিস্ট আগুন জ্বালালেন। সন্ন্যাসী তাকে কিছু সীসা দিলে আলকেমিস্ট তা একটি লোহার কড়াইয়ে রাখলেন। সীসা গলে তরলে পরিণত হলে আলকেমিস্ট তার ঝোলা থেকে অদ্ভূত হলুদ ডিমটি বের করলেন। তিনি তা থেকে চুলের মতো সরু অংশ বের করে তাতে মোম জড়ালেন। তারপর তা কড়াইয়ে দিলেন। সীসার সাথে তা মিশে গেল।

মিশ্রণটি লালাভ হলো, প্রায় রক্ত-রঙের মতো। আলকেমিস্ট আগুন থেকে কড়াইটি নামালেন, পাশে রাখলেন ঠাণ্ডা হতে। এই কাজ করার সময় গোত্রীয় যুদ্ধ নিয়ে সন্ন্যাসীর সাথে তিনি কথা বলতে থাকলেন।

'আমার মনে হচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হতে অনেক সময় নেবে,' তিনি বললেন সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী অস্বস্তিতে ছিলেন। কাফেলাগুলো গিজায় থেমে আছে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোকে সেখানেই থাকতে হবে। 'তবে ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকর হবে,' সন্ন্যাসী বললেন।

'ঠিক তাই,' জবাব দিলেন আলকেমিস্ট।

কড়াই শীতল হলে সন্ন্যাসী আর ছেলেটা তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। সীসার তরল শুকিয়ে কড়াইয়ের আকার লাভ করেছে। তবে সেখানে আর সীসা ছিল না, সোনা হয়ে গেছে।

'আমি কি কোনো দিন এমন কিছু শিখতে পারব?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'এ হলো আমার নিয়তি, তোমার নয়,' আলকেমিস্ট জবাব দিলেন। 'তবে আমি তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম, এমন কিছু করা সম্ভব।'

তারা মঠের দরজার সামনে গেলেন। সেখানে আলকেমিস্ট চাকতিকে চার টুকরা করলেন।

'এটি আপনার জন্য,' তিনি এক টুকরা সন্ন্যাসীকে দিয়ে বললেন।

'এটি তীর্থযাত্রীদের আতেথিয়তার জন্য।'

'তবে এর দাম আমার আতেথিয়তার অনেক বেশি,' জবাবে সন্ন্যাসী বললেন।

'একথা আর বলবেন না। জীবন হয়তো শুনে ফেলবে, তখন পরেরবার আপনাকে আরো কম দেবে।'

আলকেমিস্ট এবার ছেলেটার দিকে ফিরলেন। 'এটি তোমার জন্য। জেনারেলকে তুমি যা দিয়েছ, তা পুষিয়ে নিতে এই টুকরা।'

ছেলেটা বলতে চাচ্ছিল, সে জেনারেলকে যা দিয়েছে, এটি তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু সে চুপ থাকল, কারণ সন্ন্যাসীকে আলকেমিস্ট যা বলেছেন, তা সে শুনেছে।

'আর এটি আমার জন্য,' বললেন আলকেমিস্ট, তিনি একটি অংশ নিজের কাছে রাখলেন। 'কারণ আমাকে আবার মরুভূমিতে ফিরতে হবে, সেখানে গোত্রীয় লড়াই চলছে।'

তিনি চতুর্থ টুকরাটি নিয়ে সন্ন্যাসীকে দিলেন।

'এটি এ ছেলেটার জন্য, যদি তার কখনো এর দরকার হয়।'

'কিন্তু আমি তো আমার গুপ্তধনের খোঁজে যাচ্ছি,' ছেলেটা বলল। 'আমি এখন এর খুব কাছে চলে এসেছি।'

'আর আমি নিশ্চিত, তুমি তা খুঁজে পাবে,' আলকেমিস্ট বললেন।

'তাহলে এটি কেন?'

'কারণ এর মধ্যেই তুমি দুবার তোমার সব সঞ্চয় খুইয়েছ। একবার চোরের কাছে, আরেকবার জেনারেলের কাছে। আমি বুড়ো মানুষ, কুসংস্কারে বিশ্বাসী আরব। আর আমি আমাদের প্রবাদেও বিশ্বাস করি। একটি প্রবাদে বলা আছে, 'প্রতিটি জিনিসই যা একবার ঘটে, তা আর কখনো ঘটে না। কিন্তু কোনোটি দ্বিতীয়বার ঘটলে তা তৃতীয়বার ঘটবেই।' তারা তাদের ঘোড়ায় চড়ে বসলেন।

***

'আমি স্বপ্ন নিয়ে একটি গল্প বলতে চাই তোমাকে,' বললেন আলকেমিস্ট।

ছেলেটা তার ঘোড়াকে আরো কাছে নিয়ে এলো।

"প্রাচীন রোমে সম্রাট তাইবেরিয়াসের আমলে এক সৎলোক বাস করতেন। তার ছিল দুই ছেলে। একজন ছিলেন সামরিক বাহিনীতে। তাকে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দূর এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। অপর ছেলে ছিলেন কবি। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে রোমকে মাতোয়ারা করে রেখেছিলেন।

"এক রাতে বাবা স্বপ্ন দেখলেন। এক অ্যাঞ্জেল (ফেরেশতা) তার কাছে এসে বললেন, তার এক ছেলে হবে জ্ঞানী। তার কথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সারা দুনিয়ায় স্মরণ করা হবে। ঘুম ভাঙার পর তিনি কৃতজ্ঞ হলেন, কাঁদতে থাকলেন। কারণ জীবন তার প্রতি বেশ উদার। তাকে যা জানানো হলো, তা জেনে যেকোনো বাবারই গর্বিত হওয়ার কথা।

"এর কিছু দিন পর অশ্বযানের চাকায় চাপা পড়া থেকে একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন। তিনি যেহেতু সারা জীবন সত্য ও ন্যায়ের পথে কাটিয়েছেন, তাই সরাসরি স্বর্গে চলে গেলেন। স্বপ্নে যে অ্যাঞ্জেলের দেখা পেয়েছিলেন, সেখানে তার সাথে সাক্ষাত হলো।

"'আপনি সবসময় ছিলেন ভালো মানুষ,' অ্যাঞ্জেল তাকে বললেন। 'আপনি সুন্দরভাবে জীবন কাটিয়েছেন, মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি আপনার যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করব।'

"আমার কাছে জীবন ছিল সুন্দর,' লোকটি বললেন। 'আপনি যখন স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন, আমি মনে করেছিলাম, আমার সব কাজের পুরস্কার পেয়ে গেছি। কারণ আমার ছেলের কবিতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ পড়বে। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। তবে যেকোনো বাবাই তার যত্নে, শিক্ষায় বেড়ে ওঠা শিশুটির

পরবর্তীকালের খ্যাতি অর্জনে খুশি হয়। দূরবর্তী ভবিষ্যতের কোনো একসময়ে প্রচলিত আমার ছেলের সৃষ্টিকর্ম শুনতে ভালো লাগবে।'

"অ্যাঞ্জেল লোকটির কাঁধ স্পর্শ করলেন, তারা দুজনেই অনেক দূরের ভবিষ্যতের দিকে তাকালেন। তারা একটি বিশাল ভিড়ের মধ্যে পৌঁছালেন, হাজার হাজার লোক অপরিচিত এক ভাষায় কথা বলছে।

"লোকটি আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

"'আমি জানতাম, আমার ছেলের কবিতা অমর হবে,' তিনি তার কান্নাভেজা কণ্ঠে অ্যাঞ্জেলকে বললেন। 'তুমি কি আমাকে বলবে, এসব লোক আমার ছেলের কোন কবিতা বারবার পাঠ করছে?'

"অ্যাঞ্জেল লোকটির কাছাকাছি এলেন, আবেগঘনভাবে তাকে কাছের এক বেঞ্চে নিয়ে গেলেন। সেখানে তারা বসলেন।

"আপনার যে ছেলে কবি ছিলেন, তার কবিতা রোমে খুবই জনপ্রিয় ছিল, অ্যাঞ্জেল বললেন। 'সবাই তার কবিতা ভালোবাসত, সবাই উপভোগ করত। তবে তাইবেরিয়াসের শাসন অবসানের পরপরই তার কবিতা বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। আপনি এখন যার সৃষ্টিকর্ম শুনছেন, সেগুলো সামরিক বাহিনীতে থাকা আপনার অপর ছেলের।'

"লোকটি বিস্মিত হয়ে অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকালেন।

"'আপনার ছেলে অনেক দূরে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন। তিনি রোমান সেনাপতি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও ভালো। এক বিকেলে তার এক চাকর অসুস্থ হয়ে পড়ল। মনে হলো, সে মারা যাবে। আপনার ছেলে রোগ নিরাময় করতে পারেন - এমন এক রাব্বির কথা শুনেছিলেন। তিনি তার সন্ধানে কয়েক দিন ঘোড়া ছোটালেন। চলার পথে তিনি জানলেন, তিনি যে লোকের খোঁজ করছেন, তিনি ঈশ্বরের সন্তান। তার মাধ্যমে রোগমুক্ত আরো অনেক লোকের সাক্ষাত পেলেন তিনি। তারা ওই লোকের শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ছেলেকে অবহিত করল। আর আপনার ছেলে রোমান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধর্ম গ্রহণ করলেন। এর কিছু সময় পরই তিনি যে লোকের সন্ধানে বের হয়েছিলেন, তার কাছে পৌঁছালেন।'

"'তিনি ওই লোককে বললেন, তার এক চাকর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওই রাব্বি তার বাড়ি যাওয়ার জন্য সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সেনাপতি ছিলেন বিশ্বাসী মানুষ। তিনি রাব্বির চোখের দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন, তিনি নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর-পুত্রের উপস্থিতির মধ্যে রয়েছেন।'

"'আর এসব কথাই আপনার ছেলে বলেছিলেন,' অ্যাঞ্জেল লোকটিকে বললেন। 'এই কথাগুলোই তখন আপনার ছেলে রাব্বিকে বলেছিলেন, ওই কথাগুলো আর কখনো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি : "আমার প্রভু, আমি এমন মূল্যবান নই যে আমার ছাদের নিচে আপনি যাবেন। মাত্র একটি কথা বলুন, তাতেই আমার চাকর রোগমুক্ত হয়ে যাবে।"'

আলকেমিস্ট বললেন, 'কে কী করছে, তা কোনো ব্যাপারই নয়। এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই পৃথিবীর ইতিহাসে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। আর সাধারণত সে তা জানে না।"

ছেলেটা হাসল। সে কখনো কল্পনাও করেনি, জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন এক রাখালের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

'বিদায়,' আলকেমিস্ট বললেন।

'বিদায়,' ছেলেটা বলল।

***

ছেলেটা একাকী কয়েক ঘণ্টা মরুভূমির ওপর দিকে ঘোড়া ছোটাল, খুব আগ্রহ নিয়ে তার হৃদয় কী বলে তা শুনল। তার হৃদয়ই তাকে জানিয়ে দেবে, কোথায় লুকিয়ে আছে গুপ্তধন।

'গুপ্তধন যেখানে আছে, তোমার হৃদয়ও সেখানে থাকবে,' আলকেমিস্ট তাকে বলেছিলেন।

তবে তার হৃদয় অন্য কথা বলছিল। গর্বের সাথে সে এই রাখালের কথা বলছিল, দুবার আলাদাভাবে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, তা পূরণের জন্য সে তার ভেড়ার পাল ছেড়েছিল। সে নিয়তি এবং আরো অনেকে লোকের কথা বলছিল, যারা দূরের ভূমি বা সুন্দরী নারীর খোঁজে বের হয়েছিল, তাদের সময়ের বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে অনড় থাকা লোকদের মুখোমুখি হয়েছিল। সে সফর, আবিষ্কার, গ্রন্থরাজি, পরিবর্তনের কথা বলেছিল।

সে আরেকটি বালিয়াড়ির উপরে উঠতে যাচ্ছিল। তখনই তার হৃদয় ফিসফিসিয়ে বলে ওঠল, 'ওই স্থানটি লক্ষ রাখবে, যেখানে তোমার কান্না আসবে। ওখানেই আমি আছি, ওখানেই আছে তোমার গুপ্তধন।'

ছেলেটা ধীরে ধীরে বালিয়াড়িতে উঠল। তারায় ঝলমলে আকাশে আবার চাঁদ ওঠেছে : মরুদ্যান থেকে যাত্রা করার পর এক মাস হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় বালিয়াড়িগুলোতে ছায়া পড়েছে, মনে হচ্ছে ওগুলো চলমান সাগর। বিষয়টি ছেলেটাকে মরুভূমিতে ঘোড়ার শব্দ করা দিনটির কথা মনে করিয়ে দিলো। ওই দিন সে জেনেছিল আলকেমিস্টকে। এবং মরুভূমির নীরবতা আর একজনের গুপ্তধন সন্ধানের সফরে ঢুকে গেল চাঁদ।

বালিয়াড়ির উপরে উঠার পর তার হৃদয় তখন লাফাচ্ছিল। সেখনে চাঁদের প্রভা আর মরুভূমির উজ্জ্বলতায় মিসরের সৌম্য ও রাজকীয় পিরামিড ভাস্কর হয়ে আছে।

ছেলেটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, কাঁদতে শুরু করল। সে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল নিয়তির প্রতি বিশ্বাসী করার জন্য এবং চলার পথে এক রাজা, এক ব্যবসায়ী, এক ইংরেজ ও এক আলকেমিস্টের সাথে তার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য। সবচেয়ে বেশি সে কৃতজ্ঞ হলো, মরুভূমির ওই নারীর সাথে তার

সাক্ষাত করিয়ে দেওয়ার জন্য, যে তাকে বলেছিল, ভালোবাসা কখনো কোনো পুরুষকে তার নিয়তি থেকে সরিয়ে রাখে না।

যদি সে চায়, তবে এখন মরুদ্যানে ফিরে যেতে পারে, ফাতিমার কাছে ফিরতে পারে, সাদামাটা এক রাখাল হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। আলকেমিস্টের কথাই ধরা যাক। তিনি যদিও জগতের ভাষা বোঝেন, জানেন কিভাবে সীসাকে সোনায় পরিণত করতে হয়, কিন্তু তবুও তিনি মরুভূমিতেই বসবাস করছেন। কাউকে নিজের বিজ্ঞান ও শিল্পকলা প্রদর্শনের দরকার পড়েনি তার। ছেলেটা নিজেকে বলল, নিজের নিয়তি পূরণ করতে গিয়ে সে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখেছে, সে যত কিছুর স্বপ্ন দেখেছিল, সবকিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

তবে এখন সে তার গুপ্তধন পাওয়ার সন্ধিক্ষণে রয়েছে। এখন সে নিজেকে মনে করিয়ে দিলো, কোনো কাজই সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না এর লক্ষ্য হাসিল হয়। ছেলেটা তার চারপাশের বালুর দিকে তাকাল। দেখল যেখানে তার চোখের পানি পড়েছে, সেখানে একটি গুবরে পোকা বালির উপর দিতে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। মরুভূমিতে থাকার সময় সে জেনেছে, মিসরে গুবরে পোকাকে ঈশ্বরের নিদর্শন মনে করা হয়।

আরেকটি শুভ ইঙ্গিত! ছেলেটা বালিয়াড়ি খুঁড়তে শুরু করল। এ কাজ করার সময় তার ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর কথা মনে পড়ল। তিনি একবার বলেছিলেন, যে কেউ তার উঠানেই পিরামিড বানাতে পারে। ছেলেটা এখন দেখতে পেল, সে বাকি জীবন ধরে পাথরের উপর পাথর রাখলেও তেমন কিছু গড়তে পারবে না।

সারা রাত ছেলেটা ওই জায়গা খুঁড়ে চলল। কিন্তু কিছুই পেল না। তার মনে হলো, পিরামিড নির্মাণের পর থেকে কয়েক শ' বছর ধরে সে কেবল খুঁড়েই চলেছে। তবে সে কাজ থামাল না। বাতাসের ঝাপটা মাঝে মাঝেই তার মুখে লাগছিল। বাতাসে তার সরানো বালি ফের গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। ফলে কাজটি আরো কঠিন হয়ে ওঠছিল। ঘষায় ঘষায় তার হাত দুটি অবশ হয়ে আসছিল। তবে সে তার হৃদয়ের কথা শুনে যাচ্ছিল। সে তাকে বলেছিল, যেখানে তার চোখের পানি পড়েছে, সেখানে খুঁড়ে যেতে।

ছেলেটা তার সামনে পড়া পাথরগুলো তোলার চেষ্টা করার সময় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। কয়েকটি লোক তার সামনে হাজির হলো। চাঁদের আলোতে তাদের ছায়া পড়েছে। ছেলেটা তাদের চোখ বা চেহারা কিছুই দেখতে পেল না।

'তুমি এখানে কী করছ?' তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল।

আতঙ্কের কারণে ছেলেটা জবাব দিতে পারল না। যেখানে গুপ্তধন আছে, ওই জায়গা সে খুঁজে পেয়েছে। এখন কী ঘটতে পারে, তা ভেবে সে ভয় পাচ্ছিল।

'আমরা গোত্রীয় যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মানুষ। আমাদের দরকার টাকা,' আরেকজন বলল। 'তুমি এখানে কী লুকাচ্ছ?'

'আমি কিছুই লুকাচ্ছি না,' ছেলেটা জবাব দিলো।

তাদের একজন ছেলেটার কোমর ধরে গর্ত থেকে টেনে বের করল। আরেকজন ছেলেটার ব্যাগগুলো খুঁজল। পাওয়া গেল এক টুকরা সোনা।

'এখানে সোনা আছে,' সে বলল।

তাকে টেনে বের করে আনা আরব লোকটির চেহারায় চাঁদের আলো পড়ল। তার চোখে মৃত্যু দেখতে পেল ছেলেটা।

'সে সম্ভবত মাটির নিচে লুকানো আরো সোনা পেয়েছে।'

তারা ছেলেটাকে আরো খুঁড়তে বলল, কিন্তু সে কিছুই পেল না। তখন সূর্য উঠছিল। লোকগুলো ছেলেটাকে পেটাতে শুরু করল। তার শরীরে দাগ পড়ে গেল, রক্ত ঝরতে শুরু করল। তার পোশাক ছিঁড়ে গেছে। তার মনে হলো মৃত্যু খুবই কাছে।

'তোমাকে যদি মরতেই হয়, তবে টাকা দিয়ে কী হবে? টাকা অনেক সময় মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে না,' আলকেমিস্ট বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা চিৎকার করে লোকদের বলল, 'আমি গুপ্তধন খুঁজছি!' আর যদিও তার মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছিল, ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল, সে হামলাকারীদের বলল, সে দুবার স্বপ্ন দেখেছে, মিসরের পিরামিডের কাছে গুপ্তধন লুকানো আছে।

গ্রুপের নেতা মনে হওয়া লোকটি দলের অন্যদের বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও। মনে হয় না তার কাছে আর কিছু আছে। এই সোনার টুকরা নিশ্চয় সে অন্য কোনো জায়গা থেকে চুরি করেছে।'

ছেলেটা বালিতে পড়ে গেল, প্রায় অচেতন হয়ে। নেতাটি তাকে ধরে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি।'

তবে তারা চলে যাওয়ার আগে নেতা গোছের তরুণটি ফিরে এসে ছেলেটাকে বলল, 'তুমি মারা যাবে না। তুমি বাঁচবে। তোমার জানা উচিত, মানুষের এত বোকা হওয়া উচিত নয়। দুই বছর আগে, ঠিক এই খানে আমিও একটি স্বপ্ন দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার উচিত স্পেনের মাঠে গিয়ে রাখাল আর তার ভেড়ারা ঘুমায় এমন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত চার্চের খোঁজ করা। সেখানে ভাণ্ডার ঘরে যেখানে একটি ডুমুর গাছ গজিয়েছে, সেই স্থান খুঁজে বের করতে হবে। ওই গাছের শেকড়ের নিচে আমি লুকানো গুপ্তধন পাবো। কিন্তু আমি এত বোকা নই যে একটি পুরো মরুভূমি পাড়ি দেবো স্রেফ স্বপ্ন দেখার কারণেই।'

তারপর তারা চলে গেল।

ছেলেটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। আরেকবার পিরামিডের দিকে তাকাল। মনে হলো তার দিকে তাকিয়ে পিরামিডগুলো হাসছে। সেও তাদের দিকে চেয়ে হাসল। তার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠল।

কারণ এখন সে জানে, কোথায় আছে গুপ্তধন।

উপসংহার

ছেলেটা যখন ছোট, পরিত্যক্ত চার্চটায় পৌঁছাল, তখন রাত নেমে এসেছে। ভাণ্ডার ঘরে তখনো ডুমুর গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। তারাগুলো তখনো ভাঙা ছাদ দিয়ে দেখা দিচ্ছিল। ভেড়ার পাল নিয়ে সে যখন এখানে এসেছিল, সেই দিনের কথা মনে পড়ল তার। সেটি ছিল শান্তিময় রাত... কেবল স্বপ্নটি ছাড়া।

এখন তার সাথে ভেড়ার পাল নেই, তবে আছে একটি কোদাল।

সে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঝোলা থেকে মদের বোতলটি বের করে একটু পান করল। মরুভূমির ওই রাতের কথা মনে পড়ল, যখন সে আলকেমিস্টের সাথে বসেছিল। তারা একসাথে বসে তারকা দেখতে দেখতে পান করছিল। তার মনে পড়ল, অনেক পথ সে পাড়ি দিয়েছে, ঈশ্বর গুপ্তধনের সন্ধান দিতে অদ্ভুত পথ বেছে নিয়েছিলেন। সে যদি দু'বার দেখা স্বপ্নে বিশ্বাস না করত, তবে জিপসি নারী, রাজা, চোর কিংবা ... কারো সাথে তার দেখাই হতো না। 'ওহ, কত লম্বা তালিকা। তবে পথটি শুভ-অশুভ ইঙ্গিতেই লেখা ছিল। তাই তা মিথ্যা প্রমাণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না,' ছেলেটা নিজে নিজে বলল।

সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙার পর দেখল সূর্য তখন অনেক উপরে। সে ডুমুর গাছের শেকড় খুঁড়তে শুরু করল।

'তুমি তো বুড়ো ভেল্কিবাজ,' আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল ছেলেটা। 'তুমি পুরো গল্পই তো জানতে। এমনকি মঠে আমার জন্য এক টুকরা সোনাও রেখে গিয়েছিলে যাতে আমি এই চার্চে ফিরে আসতে পারি। ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ফিরতে দেখে সন্ন্যাসী হেসেছিলেন। তুমি কি আমাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারতে না?'

'না,' সে বাতাসে একটি কণ্ঠ শুনতে পেল। 'আমি তোমাকে বললে, তুমি কখনো পিরামিড দেখতে যেতে না। ওগুলো সুন্দর না?'

ছেলেটা হাসল। তারপর খুঁড়তে শুরু করল। আধা ঘন্টা পর তার কোদাল শক্ত কিছুর সাথে লাগল। এক ঘন্টা পর সে স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রায় ভরা একটি বাক্স পেল। বাক্সে মূল্যবান পাথর, লাল ও সাদা পালকে শোভিত সোনার মুখোশ, অলঙ্কারে

পরিপূর্ণ নানা মূর্তি পেল। বিজেতাদের লুণ্ঠিত সামগ্রীর কথা দেশটি অনেক অনেক আগেই ভুলে গিয়েছিল। কোনো বিজয়ী তার সন্তানদের এ সম্পর্কে কিছু বলে যেতে পারেননি।

ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে উরিম আর থুমিম বের করল। সে মাত্র একবার পাথর দুটি ব্যবহার করেছে - ওই বাজারে এক সকালে। তার জীবন ও তার পথ সবসময় দেখিয়েছে একটির পর একটি ইঙ্গিত।

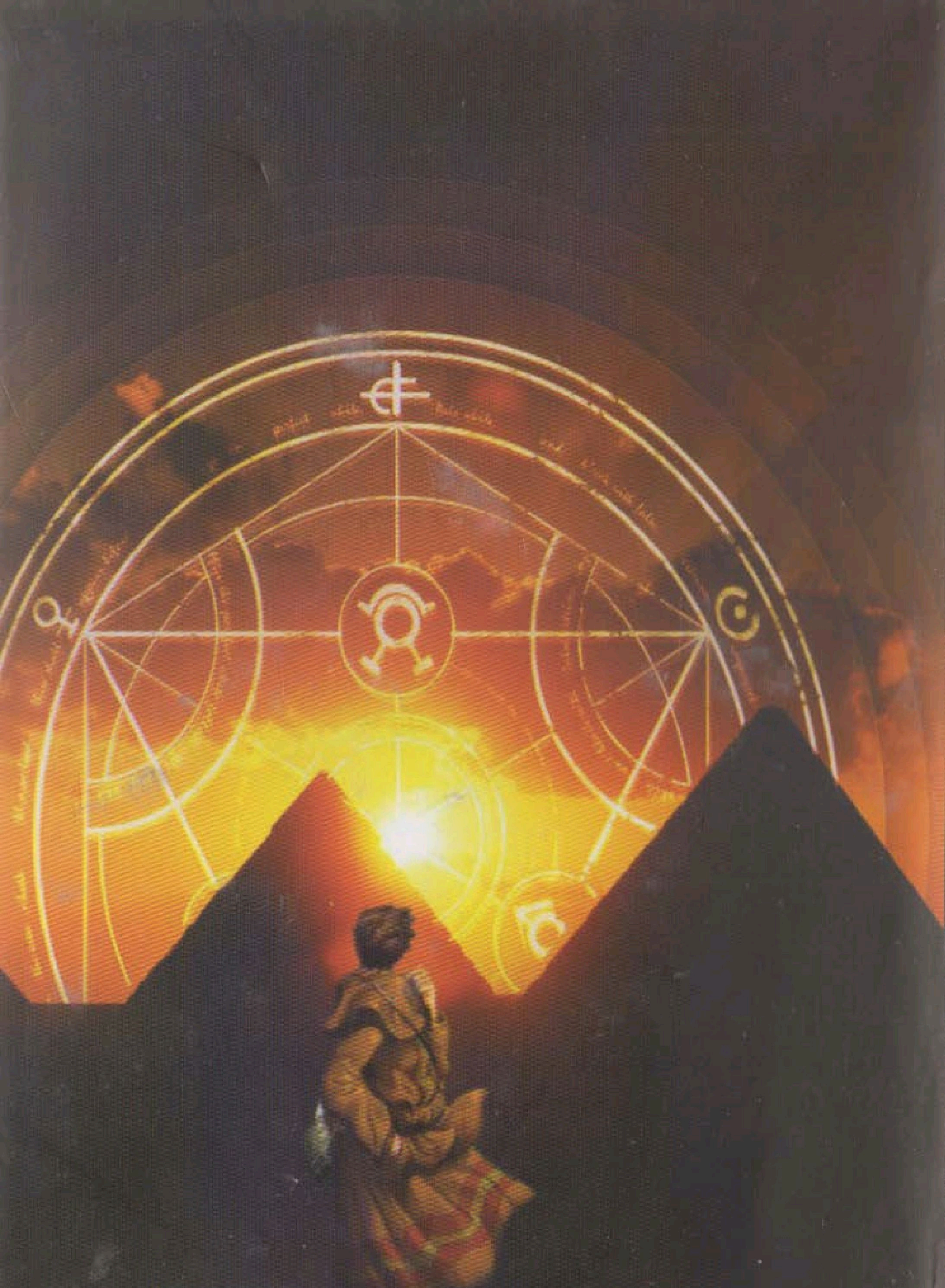
সে উরিম আর থুমিম রাখল বাক্সটিতে। এগুলোও তার নতুন পাওয়া গুপ্তধনের অংশ। কারণ এ দুটি পাথর তাকে বুড়ো রাজার কথা মনে করিয়ে দেবে। তিনি হয়তো আর কখনো দেখা দেবেন না।

যারা তাদের নিয়তির পেছনে ছোটে, তাদের প্রতি জীবন আসলেই উদার - কথাটি সত্য, ছেলেটা ভাবল। তারপর তার মনে পড়ল, তাকে তারিফায় যেতে হবে। কারণ জিপসি নারীকে তার সম্পদের এক-দশমাংশ দিতে হবে। সে ওয়াদা করেছিল। 'ওই জিপসিরা খুবই স্মার্ট হয়' - সে ভাবল। হয়তো তারা অনেক ঘোরাঘুরি করে বলে এত স্মার্ট।

বাতাস আবার প্রবল বেগে বইতে শুরু করেছে। এই বাতাসের নাম লেভেন্টার। এই বাতাস আসে আফ্রিকা থেকে। এ বাতাস সাথে করে মরুভূমির ঘ্রাণ আনেনি, মুরিশ আক্রমণকারীদের হুমকিও নিয়ে আসেনি। বরং বয়ে এনেছে তার খুবই পরিচিত পারফিউমের খুশবু, আর একটি চুমুর ছোঁয়া। ওই চুমু এসেছে অনেক দূর থেকে, ধীরে ধীরে ভেসে বেড়িয়েছে তার ঠোঁট দুটি স্পর্শ না করা পর্যন্ত।

ছেলেটা হাসল। এই প্রথমবার মেয়েটা এমন কাজ করেছে।

'আমি আসছি, ফাতিমা,' সে বলল।



https://www.facebook.com/anyadhara অন্যধারা

ISBN:978-984-93661-7-1
9789849366171